সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বড়দিন সংখ্যা
২০২২ খ্রিস্টাব্দ
Christmas

যিশুকে পেতে পথ চলি একসাথে

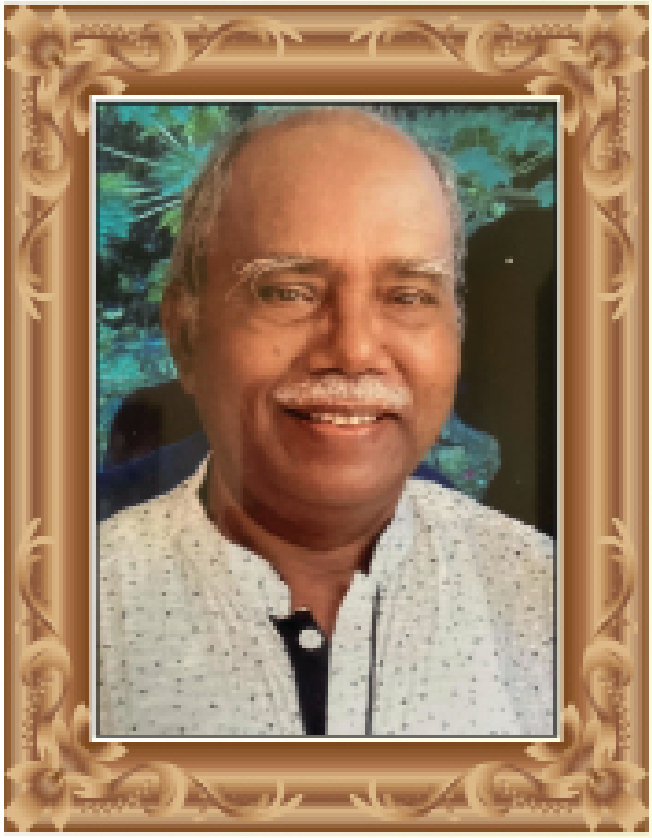

বাবা / দাদু
আমরা তোমায়
অনেক অনেক ভালবাসি

প্রয়াত আলফন্স রোজারিও

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া মিশন, ছোট সাতানীপাড়া

মৃত্যু : ৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
(ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকা)

গ্রাম: কুচিলাবাড়ি
মঠবাড়ি মিশন, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

দেখতে দেখতে দুই বছর চলে গেল, আবার ফিরে এলো বড়দিন ও নতুন বছর। এতো তাড়াতাড়ি তুমি আমাদেরকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবে, তা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। তেমন কোন অসুস্থতার লক্ষণও তোমার মধ্যে আগে থেকে পরিলক্ষিত হয়নি। তারপরেও কঠিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে-সব মিলিয়ে প্রায় এক মাসের মধ্যেই একজন জলজ্যান্ত মানুষ থেকে শুধুই ছবি হয়ে গেলে সবার কাছে। অনন্তের অসীম নীলিমায় হারিয়ে গেলে তুমি। তোমাকে ছাড়া আমাদের কোন কিছুই আর পরিপূর্ণতা পায় না। কোন পার্বণ বা কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান, কোন কিছুতেই না। একটা অপূরণীয় শূন্যতায় নিমগ্ন থাকে সবাই। খেতে গেলে ও সন্ধ্যা প্রার্থনার সময় তোমার চেয়ারখানা খালি পড়ে থাকে। রাতে ঘরে ফিরতে দেরী হলে – আর তোমার ফন বেজে ওঠে না। কেউ আর আদরমাখা গলায় বলে না "দেরী করতেছো কেন? তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে খেয়ে বিশ্রাম করো।" আবার বাড়ি ফিরলে তোমার স্নেহমাখা স্নিগ্ধ হাসি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যেতো-সব কালিমা দূর হয়ে যেতো। এখন সেইসব কিছুই একটা ছবিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় শত কষ্টের মধ্যেও কোনদিন বলো নাই-কষ্টের কথা। "কেমন আছো"-জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে "আমি তো ভালই আছি।" জীবনযুদ্ধে তুমি কখনও পিছু পা হওনি-ছোটবেলা হতে অধ্যবসায়ের দ্বারা কিভাবে বড় হওয়া যায় ও জীবনে উন্নতি করা যায়-তা তুমি আমাদেরকে শিখিয়েছ। অলসতা তুমি মোটেও পছন্দ করতে না। তুমি ছিলে কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তী। সময়ের কাজ সময়ে ও নিজের কাজ নিজে করতে তুমি উৎসাহিত করতে সবাইকে। মা মারীয়ার প্রতি তোমার অসীম ভক্তি ছিলো। রোজই রোজারিমালা হাতে করে হাঁটতে বেরোতে এবং সন্ধ্যায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিয়মিত রোজারিমালা প্রার্থনা করতে-নিয়মিত গির্জায় যেতে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে।

তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো আমরা যেন তোমার আদর্শে চলতে পারি এবং ঈশ্বরের পথ থেকে যেন বিচ্যুত না হই।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের বাবা / দাদু-কে স্বর্গে অনন্ত শান্তি দান করুন।

সবার প্রতি রইলো শুভ বড়দিন ও বাংলা নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

তোমার সহধর্মিনী
সিসিলিয়া রোজারিও

তোমার স্নেহধন্য -
পুত্র ও পুত্রবধূগণ এবং একমাত্র কন্যা ও জামাতা

তোমার অনেক আদরের নাতি-নাতনিরা ও নাত জামাই
ঐশী ও ইভান্স, যাকোব, অর্পী, অপ্সী, অহনা, প্রাপ্তি, কৃপা, অপু, অবনী, রাসেল, মারিয়া ও সায়াম।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

- যিশুর শিশু ধ্যান -*বিশপ থিওটনিয়াস গমেজ সিএসসি* ◆৯
- বড়দিন: ঈশ্বর ও মানুষের এবং স্বর্গ ও মর্তের মিলন উৎসব -*ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা* ◆১১
- বড়দিন উদ্‌যাপন অনুচিন্তন সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কিছু অজানা কথা -*ফাদার লেণার্ড রিবেরু* ◆১২
- দরিদ্রদের মাঝে যিশুর জন্ম -*ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি* ◆১৬
- হৃদয় গোশালায় যিশুর দেহধারণ -*মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া* ◆১৮
- বড়দিন: একটি উপহারের নাম! -*ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ* ◆১৯
- সবার জীবনে 'বড়দিন' কি সত্যিই বড়দিন! -*কমল পালমা* ◆২১
- পোপ ফ্রান্সিসের ভাবনায় বড়দিন -*ফাদার এলিয়াস সরকার এসজে* ◆২৩
- বড়দিন উদ্‌যাপন হলো পরিবারের মহোৎসব -*ফাদার লুইস সুশীল* ◆২৫
- পরিবারে বড়দিন ও বাস্তবতা -*শ্যামল হিলারিউস কস্তা* ◆২৭
- মারীয়ার কোলে যিশু ও আমি -*সিস্টার মমতা ভূইয়া এসসি* ◆২৮
- ক্ষুদ্র গোশালায় জন্মদিনের আনন্দ -*ফাদার মাইকেল দেউরী* ◆৩০
- বাণীর দেহধারণ: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ -*ফাদার প্যাট্রিক গমেজ* ◆৩২
- অস্ত্রে বিদ্ধ মানবতা -*ভিনসেন্ট তিতাস রোজারিও* ◆৩৪
- বাঙালির নিজ সংস্কৃতিতে বড়দিন উৎসবের আনন্দধারা -*ফাদার আলবার্ট রোজারিও* ◆৩৫
- ঈশ্বরের প্রশংসায় উল্লসিত মারীয়া -*সিস্টার পুসন রোজারিও আরএনডিএম* ◆৩৬
- আমাদের জীবনে বড় দিনের মাহাত্ম্য -*ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি* ◆৩৭
- বড়দিনের সামসঙ্গীত: মুক্তি ও ন্যায় বিচারের জয়গান -*ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা* ◆৩৮
- সংকটময় বিশ্বে মুক্তিদাতার জন্মতিথি বার্তা -*আলবার্ট বকুল ক্রুশ* ◆৪০
- রাখালদের কাছে যিশুর আত্মপ্রকাশ -*ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও* ◆৪৪
- বড়দিন: ভালবাসার জন্মদিন -*সিস্টার ড. মেরী হেনরিয়েটা এসএমআরএ* ◆৪৫
- কারিতাস কার্যক্রম ◆৪৬

খোলা জানালা

- শিশুর সুরক্ষায় পরিবারের ভূমিকা -*শিশির আঞ্জেলো রোজারিও* ◆৫০
- নৈতিকতার অবক্ষয়: গ্রামীণ জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা -*আগষ্টিন ডি'ক্রুজ* ◆৫২
- যারা অপমানেও ধন্য -*চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু* ◆৫৫
- তোমরা সাপের মতো সাবধানী হও -*ফাদার গৌরব জি পাথাং সিএসসি* ◆৫৮
- বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায় জানমালে কতটুকু নিরাপদ -*যোসেফ শরৎ গমেজ* ◆৫৯
- বাংলাদেশ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে আলো ছড়ানো এক নক্ষত্র যেরোম ডি কস্তা -*ডা: নেভেল ডি রোজারিও* ◆৬০
- ভাঙ্গনের শব্দ শুনি -*ডেভিড স্বপন রোজারিও* ◆৬২
- শিকড়ের সন্ধানে -*পলিকার্প ললিত ও মালতী গোমেজ* ◆৬৫
- বিয়ের অনুষ্ঠানে আতিশয্য আর নয় -*রক রোনাল্ড রোজারিও* ◆৬৯
- ব্যতিক্রমী রান্না -*ধুমকেতু* ◆৭০
- মুক্তিযুদ্ধে স্মৃতি অম্লান হয়ে থাক -*ফেলিক্স আশাক্রা* ◆৭১
- এক মুক্তিযোদ্ধার স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বড়দিন -*আব্রাহাম অরুন ডি'কস্তা* ◆৭১
- সম্পর্কের প্রগাঢ়তায় তুমি আমি -*মিতালি মারীয়া কস্তা* ◆৭২
- সংসারে প্রয়োজন ভালবাসার মাদকতা -*বেনেডিক্ট মূর্মূ* ◆৭৩
- বড়দিনে গির্জায় যাওয়ার পথে -*শিশির আলেকজান্ডার কস্তা* ◆৭৪
- ওয়েটিং রুম -*জয় বার্নাড কার্ডোজা* ◆৭৬
- নারী তুমি ধরিত্রী -*অর্পা কুজুর* ◆৭৮

যুব তরঙ্গ

- বর্তমান প্রেক্ষিত: যুবদর্শন ও খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ -*ফাদার ড. মিন্টু লরেন্স পালমা* ◆৭৯
- তথ্য-প্রযুক্তির যুগে পরিবারে, সমাজে ও মণ্ডলীতে চ্যালেঞ্জের ধরণ ও তা উত্তরণে করণীয় -*ফাদার পল গমেজ* ◆৮২
- যুব আনন্দের বড়দিন -*লিটন ইসাহাক আরিন্দা* ◆৮৪

মহিলাঙ্গণ

- মুক্তিযুদ্ধে দেশপ্রেমিক সংগ্রামী নারীদের অবদান -*সিস্টার মেরী কনসোলাটা এসএমআরএ* ◆৮৫
- সাদা কালো জীবন-৮ -*মালা রিবেরু* ◆৮৮
- ক্রীড়া জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র একজন মিউরেল গমেজ এর কথা -*পিটার ডেভিড পালমা ও শুভ পাক্কাল পেরেরা* ◆৮৯

স্বাস্থ্য কথা

- মনোবিজ্ঞানীর চোখে বড়দিন -*সিস্টার ড. লিপি গ্লোরিয়া ও জেমস্ সাইমন দাস* ◆৯১
- নারী স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় করণীয় -*ডা. জেসি জেকলিন রোজারিও* ◆৯৩
- হাঁটু ব্যথার কারণ, প্রতিকার, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ -*ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও* ◆৯৫

ভ্রমণ কাহিনী/স্মৃতিকথা

- সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের তীর্থস্থান গোয়াতে বাংলাদেশ কাথলিক টিচার্স টিম -*হিউবার্ট যোসেফ গমেজ* ◆৯৮
- দুই ইটের উপর দাঁড়িয়ে মতিঝিল থেকে নিউ ইয়র্ক যাত্রা -*অসীম বেনেডিক্ট পামার* ◆১০০
- ইউরোপ ভ্রমন ও তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতা -*জেম্‌স গমেজ (আদি)* ◆১০১
- জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টে কিছু সময় ঘোরাঘুরি -*দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ* ◆১০৩

নাটিকা

- এক সাথে পথ চলি -*সুনীল পেরেরা* ◆১০৫

গল্প

- আমেরিকানদের কুকুরপ্রীতি -*খোকন কোড়ায়া* ◆১০৮
- তনিমাদের লড়াই -*প্রদীপ মার্সেল রোজারিও* ◆১০৯
- অন্য এক দুনিয়া -*ভ্যালেন্টিনা অপর্ণা গমেজ* ◆১১২
- কাঁচাগোল্লা -*সাগর কোড়াইয়া* ◆১১৪
- গোলাপদা -*খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন* ◆১১৬
- স্বপ্নের দেশে বিলাইয়ের মা -*শিউলী রোজলিন পালমা* ◆১১৮
- লাঠি -*মিল্টন রোজারিও* ◆১২০
- এক পশ্‌লা বৃষ্টি -*রবার্ট এ চিরান* ◆১২৩
- গ্র্যান্ডমাদার -*জেন কুমকুম ডি'ক্রুজ* ◆১২৫
- সন্ধান -*আবু নেসার শাহীন* ◆১২৭
- স্বার্থক বড়দিন -*জ্যাকুলীন সুইটি গমেজ* ◆১৩০

কলাম

- ঢাকার এক বিস্মিত বইয়ের দোকান -*হিউবার্ট অরুন রোজারিও* ◆১৩২
- মিশন ও মিশনারী কাজ -*ফাদার দিলীপ এস. কস্তা* ◆১৩৩

ছোটদের আসর

- কিছু টাকা আমার ব্যাগে রেখে দেই -*জয় আন্তনী রোজারিও* ◆১৩৫
- একটি শিশির বিন্দু -*হেলেন রোজারিও* ◆১৩৬
- অতি বুদ্ধির চমকানী -*সিস্টার মেরী এনিটা এসএমআরএ* ◆১৩৬
- পবিত্র বাইবেল থেকে লেখা, মানব জাতির জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা -*মাস্টার সুবল* ◆১৩৭

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

- *ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু* ◆১৪০

বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীতে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করে গেছেন এবং ঐতিহাসিক কাজে যারা নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়ে রেখে গেছেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা আজ তাদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি।
আজ, তাদের আমার শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি যারা আমার ব্যক্তি জীবনে সৌভাগ্যক্রমে আমি সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং যাদের কাছে আমি চিরঋণী।

Bp. L. Graner CSC

Fr. J. Jack Hennessy CSC

Bro. P. Kozlowski CSC

Bro. walter J. Ramlinger CSC

Bro. Andrew J. Baffes CSC

Bro. J. Bede Boderick CSC

Bro. James J. Taliarovic CSC

Bro. Hubert F. Pieper CSC

Bro. Tomes O'Keefe CSC

Bro. Fulgence J. Dougherty CSC

Bro. Ivan D. CSC

Bro. Dobald Schmitz CSC

Bro. Robert B. Hughes CSC

Arch Bp. Michael Rozario

Bp. Joachim Rozario, CSC

Bro. Brian J. Lyan CSC

Fr. T. Zimmerman CSC

Fr. Dominic Rozario CSC

Fr. Peter CSC

Fr. Urban Corraya

Fr. Houser CSC

Fr. J. Stephen E. CSC

Fr. Evance CSC

Fr. Paul Gomes

Bp. Michael A. Rozario

Arch Bp. Moses M. Costa, CSC

সকল আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের প্রতি রইলো আমার এবং পরিবারের পক্ষ থেকে বড়দিন এবং নববর্ষের শুভেচ্ছা

শুভেচ্ছান্তে
ড. অগাস্টিন ক্রুজ ও পরিবারবর্গ
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সেন্ট জোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
বর্ষ : ৮২ : বড়দিন সংখ্যা
ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
পৌষ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
শুভ পাস্কাল পেরেরা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

বড়দিন প্রতিদিন

সৃষ্টির পর থেকেই মানব ঈশ্বরের সান্নিধ্যে স্বর্গসুখেই ছিল যা পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকের সৃষ্টিকাহিনীতে বর্ণিত আছে। তবে লোভের বশবর্তী হয়ে বড় হবার বাসনায় মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করে। মানব নিজেই নিজেকে স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত করলেও ঈশ্বর কিন্তু সবসময়ই মানুষকে ভালবেসে গেছেন। যুগ যুগ ধরে ধারাবাহিকভাবে তিনি তা প্রকাশ করে গেছেন বিভিন্ন ভাববাদী ও ঈশ্বরভক্ত মানুষের মধ্যদিয়ে। সময়ের পূর্ণতায় মানুষের মুক্তিকল্পে ঈশ্বর তাঁর পুত্রকেই এ জগতে পাঠালেন। যিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে নাজারেথের মারীয়া নামের এক কুমারীর গর্ভে অলৌকিকভাবে জন্ম নিয়ে 'যিশু' নাম গ্রহণ করেন। ঈশ্বর তনয় যিশুর জন্মদিনই 'বড়দিন'; যা ঐতিহ্যগতভাবে ২৫ ডিসেম্বর সারাবিশ্বেই অতীব আনন্দ ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। ঈশ্বর মানুষ হয়ে মানুষকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। আর সঙ্গত কারণেই ঈশ্বরের মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করার ঘটনাটি মানব মুক্তির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা ও সকলের বড়দিন। ত্রাণকর্তা যিশুর জন্মের মধ্যদিয়েই স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে আনন্দময় সেতুবন্ধন রচিত হয়। তাই যিশুর জন্মদিন: বড়দিন মানবজাতির আনন্দের দিন।

পবিত্র বাইবেল ও মণ্ডলীর পরম্পরা শিক্ষা এ কথা বলে যে, যিশুর জন্ম দীন-হীন অবস্থায় এক গোশালায় হলেও স্বর্গীয় দূতবাহিনী, প্রান্তরের দীন-দুঃখী রাখাল ও গোশালার প্রাণীকূল আনন্দ প্রকাশ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, সমাজের চোখে নির্বোধ ও পিছিয়ে পরা রাখালগণই অবুঝ প্রাণীদের সাথে রাজাধিরাজ যিশুকে দেখতে পেয়েছে। বড়দিনের ঘটনাটি সাধারণ মানুষ, নগণ্য বস্তু ও ক্ষুদ্র স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ঈশ্বর তাঁর অসামান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করেছেন সামান্য ও ক্ষুদ্রদেরকে। বড়দিনের ঘটনা আমাদের সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ঈশ্বর আজ নতুন করে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন যেন সামান্য হিসেবে আমরা তাঁর পরিকল্পনার অংশীদার হবার জন্য প্রস্তুত হতে পারি। ঈশ্বর পিতা তাঁর পুত্রকে জগতে পাঠিয়েছিলেন তাঁর পরিকল্পনা পুনরুদ্ধার করতে; যা তিনি এখনো করে যাচ্ছেন আমাদের সাথে- আমাদের মধ্যদিয়ে। প্রতি বড়দিনেই ঈশ্বর আমাদের খুঁজেন। যারা সামান্য, ক্ষুদ্র, সাধারণ, নগণ্য যেন তাদের তিনি ব্যবহার করতে পারেন তাঁর অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য। আমরা অযোগ্যরা প্রতিদিন যখন ক্ষুদ্রদের, পিছিয়ে পরা ও প্রান্তিকজনের পাশে থাকি তখনই বড়দিনের মূল্যবোধে চলি।

বড়দিনের আনন্দ এক দীন শিশুকে নিয়ে। কেননা এ শিশুই যে ইম্মানুয়েল অর্থাৎ আমাদের সাথে ঈশ্বর। তিনি সব সময় আমাদের সাথে থাকেন এবং ভালোবাসেন। আমরা যেমন ঠিক তেমনটি করে ভালোবাসেন আর তাইতো তিনি আমাদের মাঝে বাস করেন। বড়দিন হলো মানুষের মাঝে মানুষের মতো হয়ে ঈশ্বরের আগমন। ঈশ্বর আজ আমাদের বেছেনিলেন। যিশুর দেহ ধারণ নিচে নেমে আসা কোন পরাজয় বা অপমান নয় বরং তা হলো মানুষকে উন্নতি ও তাকে ভগবৎ করার উপায়। ঈশ্বর তনয় যিশু দেহধারণ করে আমাদের একজন হলেন। সবার অন্তরের তিনি জন্ম নিলেন। যাতে আমরা তার মত হতে পারি। আমরা যেন তারই জন্য দেবতা হই কারণ তিনি আমাদের জন্য মানুষ হয়েছেন। তিনি গরীব বেশধারী হলেন, আমরা যেন তার দারিদ্র ধনী হতে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে নবীকরণের মাধ্যমে শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও যিশু-বিশ্বাসে অটল থেকে আমরা যেন হয়ে উঠি যিশুময়। তখন আনন্দ কেবলমাত্র বড়দিনকেন্দ্রিক হবে না, বড়দিনও শুধুমাত্র একদিন হবে না। কিন্তু তা হয়ে উঠবে ভক্তের প্রতিদিনের উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা ও জীবন যাপন। তাই যিশু ধ্যানে জ্ঞানে ও আচার-আচরণে আমাদের জীবনে প্রতিদিনই হোক বড়দিন।

বড়দিনের মূল্যবোধ নম্রতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, সহযোগিতা ও সহভাগিতা চর্চা করে নতুন বছর শুরু করি মানবিকতায় বড় হবার প্রত্যাশায়। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল পাঠক, লেখক, সমালোচক, শুভাকাঙ্খী, উপকারি বন্ধু-বান্ধব; সকলের প্রতি রইল বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা॥ †

স্বর্গদূত তাদের বললেন: "ভয় পেয়ো না'! আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের শুনাতে এসেছি; এই আনন্দ জাতির সমস্ত মানুষের জন্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে। আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন-তিনি সেই খ্রীষ্ট, স্বয়ং প্রভু। ***(লুক-২ : ১০-১১)***

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

বড়দিনের শুভেচ্ছা

যিশুখ্রিস্টের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে সকলকে জানাই বড়দিনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সকল বিশপ, পুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টার, বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের চেয়ারম্যান বিশপ জেমস রমেন বৈরাগীসহ সকল সদস্য-সদস্যা, 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী, লেখক-লেখিকা, উপকারী বন্ধু-বান্ধব ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি রইল কৃতাঞ্জলি। বাণীদীপ্তি, রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগ, জ্যোতি কমিউনিকেশন, প্রতিবেশী প্রকাশনী, জেরী প্রিন্টিং প্রেস-এর সকল সম্মানিত ক্রেতা, গ্রাহক ও শ্রোতাদের প্রতি রইল আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। সকলের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য এবং সফল আরেকটি বছর কামনা করছি। খ্রিস্টবর্ষ ২০২৩ সকলের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ ও আনন্দ।

ছুটির নোটিশ

শুভ বড়দিন উপলক্ষে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল বিভাগ ২৪ ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে ২ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। প্রতিবেশীর পরবর্তী সাধারণ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে আগামী ১৫ জানুয়ারি, রবিবার ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র

রেডিও ও টিভি চ্যানেলে বড়দিনের অনুষ্ঠানমালা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সরাসরি প্রযোজনা ও সহযোগিতায় রেডিও ও টিভি চ্যানেলে বড়দিন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানগুলো দেখা ও শোনার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বিটিভি'র অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান : **"বড়দিন ঘরে ঘরে"**
রচনা : **সুনীল পেরেরা**
সম্প্রচারের সময় : রাত ১০টার সংবাদের পর (ব্যতিক্রম হলে প্রতিবেশী'র ফেইবুক পেইজে ও স্থানীয় পুরোহিতের মাধ্যমে পরিবর্তিত সম্প্রচার সময় জানিয়ে দেয়া হবে)।
সহযোগিতা : বাণীদীপ্তি
তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

চ্যানেল 24'র অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান : **"আলোর ঝর্ণাধারা"**
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা : **করবী জয়ধর**
সম্প্রচারের সময় : দুপুর ১:৩০ মিনিট
তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বাংলা ভিশনে'র অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান : **"বড়দিনের শুভেচ্ছা"**
সম্প্রচারের সময় : দুপুর ৫:২৫ মিনিট
তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

অনুষ্ঠান : **"বড়দিন এলো নব সাজে"**
তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
সময় : ৪:৩০ মিনিট
প্রযোজনা : বাণীদীপ্তি

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিসের বিশেষ অনুষ্ঠান

www.veritasbangla.org
www.facebook.com/veritasbangla1

রেডিও জ্যোতি (অনলাইন)

অনুষ্ঠান : **"মহারাজ এলো ভবে"**
তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা : ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও

মঙ্গলবাণী ঘোষণায় বড়দিন

বড়দিন উৎসবে আমাদের সকল চিন্তা ও ধ্যানের লক্ষ্য ও কেন্দ্র হচ্ছে বেথলেহেমের সেই গোশালা ঘরের দৃশ্যটি। বড়দিনের সময় এই গোশালা ঘরটি নিয়ে আমরা অনেক চিন্তা করি, কথা বলি ও তা সাজানোর কাজে ব্যস্ত থাকি। অথচ গোশালা ঘরটি কিন্তু নির্বাক, কোন কথা বলে না। গোশালা ঘরে আমরা দেখি শিশু যিশু, তাঁর মা মারীয়া এবং তাঁর পিতা যোসেফকে। তারা কেউ-ই কথা বলছে না। সবকিছু ঘটছে, কিন্তু নীরবে। এমন কি রাখালেরা যখন মারীয়া, যোসেফ ও তাঁদের শিশুটিকে দেখতে গেল তখনও তাদের মুখে কোন কথা নেই; আলাপ আলোচনা, আবেগ-অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার কোন উল্লেখ সুসমাচারে নেই।

গোশালা ঘরের দৃশ্যটি এমনই যে, সবকিছু ঘটছে, সবকিছু পরিবেশিত হচ্ছে, কিন্তু নির্বাক পরিবেশ। লূক লিখিত মঙ্গলসমাচারে তিনবার এই ঘটনাটিকে গ্রীক ভাষায় "বাক্য" বা "বাণী" বলে অভিহিত করা হয়েছে। মঙ্গলসমাচারে বলা হয়েছে যে, রাখালেরা পরস্পরকে বলতে লাগল, "চল, আমরা এখন বেথলেহেমে যাই, সেখানে যা কিছু "ঘটেছে" (বাণী) বলে প্রভু আমাদের জানিয়েছেন তা একবার দেখে আসি" *(লুক ২:১৫)*। রাখালেরা আবার ফিরে গিয়ে "তার সম্বন্ধে যাকিছু শুনেছে, সেই সব "ঘটনা" (বাণী) অন্যের কাছে ব্যক্ত করল"*(২:২০)*। লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে এই যে, রাখালেরা কী দেখল সে সম্বন্ধে নয়, কিন্তু কী "ঘটেছে"(বাণী) সে সম্পর্কে তারা কথা বলছে। তাছাড়া আরও বলা হয়েছে যে, "যা কিছু ঘটেছে মারীয়া সবকিছু (বাণী) নিজের অন্তরে গেঁথে রাখলেন"*(২:১৯)*।

তাই আমরা বলতে পারি যে, যিশুর জন্মঘটনা একটি "বাণী", একটি সংবাদ রূপে আমাদের কাছে পরিবেশিত হয়েছে, যে "বাণী", আমরা দেখতে পারি, আমরা বলতে পারি, আমরা ঘোষণা করতে পারি; এবং যে বাণী আমরা ধ্যানে অন্তরে গভীরে ধরে রাখতে পারি।

বড়দিন আমাদের জন্য একটি বাণী; বড়দিন এমন একটি ঘটনা যা কথা বলে, একটা বাস্তবতা যা অতি সত্য ও অর্থপূর্ণ। বড়দিন অতীতের শুধু একটা ঘটনা নয় যা আমরা স্মরণ করি এবং যার ফলে আমাদের মধ্যে জাগে নানা অনুভূতি। বড়দিন আজ আমাদের কাছে কথা বলে।

বড়দিন আমাদের জন্য ঈশ্বরের একটি বাণী। রাখালদের কাছে যেমন, মারীয়া ও যোসেফের কাছে যেমন, আমাদের কাছেও তেমনি বড়দিন একটি বক্তব্য। রাখালদের মত আমরাও রাতের নীরবতায় বড়দিনকে একটা ঘটনা হিসাবে পেতে চাই; মারীয়ার মত আমরাও শিশুর জন্মে আনন্দ অনুভব করতে চাই; যোসেফের মত আমরাও হয়তো একটি ঘরের সন্ধান করে যাচ্ছি, কিন্তু নতুন পরিবাররূপে জীবন-যাপন করার জন্য সেই মতো ঘরের সন্ধান পাচ্ছি না।

বড়দিনের বাণী অর্থ তাৎক্ষণিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যায় না। তার কারণ বড়দিন মাত্র সূচনা। যিশুর গোটা জীবনের আলোয় শুধু বড়দিনের মর্মসত্য স্পষ্ট হতে পারে। যিশুর জন্ম এমনই একজনের জন্ম যার জীবনযাত্রা, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সমস্ত মানুষের কাছে মুক্তিদায়ী বাণী ঘোষণা করে, মানুষের নিকট ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমের রায়। আজ যে নবজাত শিশু কাঁদছে, অবাক হয়ে সবকিছু দেখছে, আর পরক্ষণেই হাসছে, সে শিশুটি জগতের শুরুতে পরমেশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। তাতেই আমরা সবাই ঈশ্বরের ভালবাসা পাই, পাপের ক্ষমা লাভ করি, তার আপনজন বলে স্বীকৃতি পাই এবং অন্তরে উপলব্ধি জীবনের নবীনতা।

অসুস্থদের প্রতি যিশুর দয়া, দরিদ্রদের প্রতি তাঁর মনোযোগ, পরিত্যক্ত, পাপী ও ভিনধর্মী লোকদের সাথে তাঁর মধুর সম্পর্ক, শিষ্যদের ভালবাসার কারণে জীবন সমর্পণে তার উদারতা এই মহান বাণীই ঘোষণা করছে যে, মানুষের সকল আশা–ভরসা নিঃশেষ হয়ে যায়নি, সংশয়-ভীতিই তার আগামী দিনের একমাত্র সম্বল নয়। যিশুর জন্মে এই বাণী পরিবেশিত হচ্ছে; নিঃসঙ্গতা, হতাশা ও মৃত্যু তারাই জয় করতে পারে যারা এই শিশুটিকে স্বাগত জানায়, যারা রাখালদের মত এই বাণীটি গ্রহণ করে নেয়, যারা এই শুভ সংবাদ আনন্দের সাথে বারবার অন্যদের নিকট জানাতে পারে।

বড়দিনের সময় মানুষের কাছে ঈশ্বরের সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে প্রেমের বাণী; মানুষ ঈশ্বরের ভালবাসা পেয়েছে, তারা স্বাধীন, তারা মঙ্গলের পথে আবার পা বাড়াতে পারে, শিশুযিশুকে সাথে করে নতুন জীবন আবার শুরু করতে পারে, ছোট শিশুদের মত হতে পারে, জীবনের অভিজ্ঞতাকে সুন্দর ও মধুর করতে পারে, এবং দেশ ও সমাজ গঠনকাজে আবার নামতে পারে।

বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি আশার বাণী। বড়দিনের সকল উপহারের পেছনে এটাই বড় সত্য। আমাদের সকল খিটখিটে মেজাজ, ঝগড়া-বিবাদ, ছোটখাট বিষয়ে আমাদের মধ্যে সৃষ্ট সকল বিচ্ছিন্নতার অন্তরালে আছে সংলাপ করার, অন্যকে বুঝার, ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসা দেওয়ার একটা বাসনা। আমাদের জীবনে এই শিশুটির প্রবেশ আমাদের জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন যে, আমাদের জন্য জীবনলাভের উদ্দেশে যাত্রাপথের দরজা খুলে গেছে।

অতএব রাখালদের সাথে এক হয়ে আমরা বলতে পারি: আমরা সরাসরি নিজেরাই এই বাণীটিকে (ঘটনা) দেখতে চাই। এই শিশুটি সম্পর্কে যা আমরা দেখেছি এবং শুনেছি তা আমরাও অন্যকে দেখাতে ও শোনাতে চাই। মারীয়ার মত আমরাও সেই সবকিছু অন্তরে গেঁথে ধ্যান করতে চাই যেন এই ঘটনাটি ক্ষণকালীণ আবেগ-অনুভূতির পরিতৃপ্তির মধ্যে সীমিত না থাকে, বরং জ্বলন্ত শিখার ন্যায় আগামী দিনগুলোতে আনন্দ, মুক্তি ও শান্তির প্রতিশ্রুতি হয়ে আমাদের মাঝে বাস করে।

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি মুক্তিদাতা যিশু আমাদের জীবন ইতিহাসে প্রবেশ করেছেন, আমাদের মানব অবস্থা আপন করে নিয়ে আমাদেরকে তাঁর ঐশজীবন ও অনুগ্রহের অংশী করেছেন। এটাই তো আমাদের জন্য মঙ্গলসংবাদ। খ্রিস্টমণ্ডলী ঈশ্বরপ্রীত সকল মানুষের কাছে এই মঙ্গলসংবাদ পরিবেশন করছে।

বড়দিন পার্বণটি আদিমণ্ডলীর পার্বণগুলোর মধ্যে অনেক দেরীতে স্থান পেয়েছে। তার কারণে মণ্ডলী খ্রিস্ট দ্বারা আনীত মুক্তি ও পরিত্রাণের রহস্য প্রথমে বুঝতে ও জীবনে অনুভব করতে চেষ্টা করেছে। মণ্ডলী প্রথমবার পুনরুত্থানেই যিশু খ্রিস্টকে মুক্তিদাতারূপে উপলব্ধি করেছে। পুনরুত্থানের পরেই মণ্ডলী তার চিন্তা ও ধ্যান প্রসারিত করেছে যিশুর জীবনের আদিতে যেখানে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। মণ্ডলী এভাবে যিশুর জন্ম ঘটনার মধ্যে আবিষ্কার করেছে ঈশ্বরের অভিষিক্তজন যিনি আমাদের মুক্তি। মণ্ডলী আবিষ্কার করেছে গোশালা ঘরের গামলায় মুক্তির মুক্তো এবং বড়দিনের ছায়ায় মুক্তির উজ্জ্বল মনি।

প্রভুযিশুর জন্মকে অতি নম্রভাবে দেখতে হবে। যিশুর জন্মটাকে নিয়ে বেশি তেরেজোর করলে, সেটাকে বেশি জোরেসোরে নাড়াচাড়া করলে আসল অর্থটা বেড়িয়ে আসতে বাধা পায়। শিশুটিকে পুতুল করে হাতের মুঠোয় যেন ধরে না রাখি। শিশুটিকে একটু কথা বলতে দিই। আমাদের নিজস্ব চিন্তভাবনা ও অন্য সবকিছুর উর্ধ্বে তাঁকে রাখি, শিশুটি আমাদের কাছে কথা বলুক, শিশুটিকে আমাদের কাছে আসতে দিই–তিনি যে উর্ধ্বলোক থেকে এসেছেন, তিনি প্রভু, তিনি মুক্তিদাতা।

ঈশ্বরপুত্রের জন্মে খ্রিস্টমণ্ডলী খুবই আনন্দিত। যিশুর আগমনের প্রভাব মণ্ডলী অনুভব করছে। তাই মণ্ডলী যীশুর জন্মের আনন্দ সংবাদ প্রকাশ করছে। নতুন শিশুর জন্মে মা যেমন, নতুন বোনের জন্মে ভাই যেমন, কনে যেমন বরের জন্য আনন্দ করে, তেমনি মণ্ডলীও খ্রিস্টজন্মের আনন্দে আনন্দিত কেননা যিশু মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণতা দিতে আসেন।

প্রভু আমাদের প্রত্যেকের অতি কাছে রয়েছেন। তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করে আমাদেরকে কাছে টেনে নিয়ে যেন বলছেন: "আমি তোমার জন্য, তোমার জীবনের জন্যে এখানে এসেছি। আমি আছি তোমার কাছে আমার হাত বাড়িয়ে দিতে, তোমাকে সাহায্য করতে, কেননা আমি চাই তুমি সুখী হও।" যিশুর এই উপস্থিতি আমরা আমাদের প্রাণঢালা ভালবাসা ও অন্তরভরা বিশ্বাস নিয়ে গ্রহণ করি।

বড়দিন ঈশ্বরের বাণী, আমাদের জন্য মঙ্গলবাণী। বড়দিন এই মঙ্গলবাণী ঘোষণা করছে। আমরা তাই বড়দিনের বাণী শুনি ও অন্তরে গেঁথে রেখে ধ্যান করি যাতে মঙ্গলবাণী পরিবেশনায় নিজেদেরকে যোগ্য করে তুলতে পারি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি
বড়দিনের কথিকা - ২০২২

বড়দিন উপলক্ষে ঢাকার আর্চবিশপের বাণী

খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় পার্বণ, প্রভুযিশুর জন্মতিথি আমরা মহাসমারোহে পালন করছি। এই শুভ লগ্নে আমি সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রভু যিশু সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ ও শান্তি।

পোপ ফ্রান্সিস সিনডাল মণ্ডলীর উদ্বোধন ঘোষণা করেছেন ১০ অক্টোবর ২০২১। সিনডাল মণ্ডলীর প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো: মণ্ডলীতে মিলন-একতা, অংশগ্রহণ এবং সবার প্রেরণ দায়িত্ব। পোপ মহোদয় বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মেষ ও মণ্ডলীর কথা ও মতামত শুনতে চেয়েছেন। এই লক্ষ্যে সমগ্র বিশ্ব থেকে প্রতিবেদন পাঠানোর পর একটা সারসংক্ষেপ আমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। শিরোনামটি হলো: তোমাদের তাবুর জায়গা বাড়াও, কৃপণতা করো না *(ইসা ৫৪:২)*। এটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ একটি শিরোনাম। সমগ্র বিশ্ব থেকে উঠে এসেছে কয়েকটি সুন্দর মতামত ও পরামর্শ। সেগুলো হলো: অনেকে মনে করছে যে, এই সিনডাল পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ গ্রহণ করতে পেরে তারা আনন্দিত কারণ তাদের মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং তারা মতামত দিয়েছেন কিভাবে মণ্ডলী যুগোপযোগী হতে পারে। তাদের মধ্যে নতুন চেতনা এসেছে। খ্রিস্টভক্তগণ আরও উপলব্ধি করছেন যে, মণ্ডলী তাঁদের নিজেদের, মণ্ডলী তাঁদের আপন গৃহ। এই প্রক্রিয়াতে আরও উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, কথা শুনা হলো অন্যকে আপন করে গ্রহণ করা। মানুষের কথা শুনাই হলো মণ্ডলীর মিশন ও বাণী প্রচার। আমাদের মধ্যে মিলন, মর্যাদা ও ঐক্যের সৃষ্টি হয় বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে। মহিলারা মণ্ডলীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সক্রিয় কর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, তাঁরা পুরুষদের মতো সমভাবে গুরুত্ব পান না। যুবা ও মহিলারা মণ্ডলীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা রাখতে চান, তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে চান। অনেকে দেখতে চায় মণ্ডলী হোক আরও স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও দায়িত্বশীল। মণ্ডলী হয়ে উঠুক আশাহত ও ভঙ্গ হৃদয় মানুষের আশ্রয়। আমরা সিনডাল আধ্যাত্মিকতার চর্চা করতে চাই আরও অন্তর গভীরে প্রবেশ করে, প্রভুর বাণী, প্রার্থনা ও নীরবতার মধ্যদিয়ে পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শুনতে চাই। এটা হবে সেই ধরণের মণ্ডলী, যেখানে সবার স্থান থাকবে, সবাই এক সাথে পথ চলবে।

এই বড়দিন আমাদের মধ্যে বয়ে আনুক মিলন ও একাত্মতা, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ দায়িত্ব পালন করার অনুপ্রেরণা। সবাইকে বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

. . . . . .

The process of Synodal Church was inaugurated on 10 October 2021 whose theme was: Communion, participation and Mission. The whole Catholic Church got involved in this process and sent the country report in August 2022. Having read all the reports the Vatican made a summary which was sent for a feedback. The title of this summary is: "Enlarge the space of your tent" *(Is 54:2)* A few beautiful insights surfaced from many countries, namely: getting engaged into the synodal process many Catholics were inspired, energized and renewed their commitment. Many experienced that they belong to the Church and Church is their home. It was strongly felt that the listening is to welcome others. Listening is already a mission and proclamation.The dignity of all Christians lies in our Baptism and all become equal by the virtue of Baptism. Women being the majority and most active in the Church, feel that they are not yet equally incorporated into the Church like men. Consequently the youth and women strongly appeal to have a greater role and participation in the Church including decision making. Let the Church become more transparent and accountable. Let she become a refuge for the wounded and broken. Through meditating the Word of God, prayer and silence we shall hear the voice of the Holy Spirit. It would be a Church where everyone will have a place and feel at home.

I wish this Christmas brings among ourselves a profound communion, active participation and enthusiasm to carry out the mission of the Church more credibly. Wishing you Merry Christmas and a Happy New Year.

+ বিজয় নি ক্রুজ, ওএমআই

+ Archbishop Bejoy N. D'Cruze OMI

Dhaka Archdiocese

বড়দিন উপলক্ষে বাণী

"যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল" (ইসা ৯ঃ১)।

পরিবারে একটি শিশু সন্তান যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন পরিবারটিকে আলোকিত করে আনন্দে ভরিয়ে তোলে। প্রভুযিশু একটি মানব পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন এবং মানুষের মত হয়ে ঐ পরিবারে বাস করেছিলেন, অর্থাৎ ঈশ্বর মানব রূপে মানব পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন। রক্ত মাংসের মানুষ রূপে ঈশ্বর এই জগতের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। তাই সাধু যোহন বলেছেন,

"বাণী একদিন হলেন রক্তমাংসের মানুষ
বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে"।

একটি পরিবারকে আলো করে প্রভু যিশু জন্ম নিয়েছিলেন। পরিবারের আলো সমস্ত জগতের সাথে এক হয়ে জগতের অন্ধকারকে দূর করতে এই জগতের মাঝে এসেছিলেন। কারণ "ঈশ্বর আলো, তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই" *(১ যোহন ১:৫)*। কিন্তু জগতের মধ্যে আলো যেমন আছে তেমনি অন্ধকারও রয়েছে, রয়েছে পাপ ও পুণ্য, ভাল ও মন্দ, বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততা, বাধ্যতা ও অবাধ্যতা, ন্যায় ও অন্যায় ইত্যাদি। পোপ মহোদয় বলেছেন, আমরা যদি ঈশ্বর ও আমার প্রতিবেশি ভাইবোনকে ভালবাসি তা হলে আমরা আলোর পথে চলি। কিন্তু আমরা যদি অহংকার, প্রতারণা, আত্মকেন্দ্রিকতা দ্বারা প্রভাবিত হই তখন অন্ধকার আমাদেরকে ঘিরে ধরে। তাইতো পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, "কিন্তু নিজের ভাইকে যে ঘৃণা করে, সে অন্ধকারে রয়েছে ও অন্ধকারে চলে; কোথায় যাচ্ছে তা জানে না, কারণ অন্ধকার তার চোখ অন্ধ করেছে" *(১ যোহন ২ঃ১০)*।

যিশু আমাদের এই অন্ধকার অবস্থা থেকে মুক্ত করতে এই জগতে এসেছিলেন। যিশু ঈশ্বরের সেই ভালবাসা প্রকাশ করতে মানব দেহ ধারণ করে এই জগতের মাঝে মানুষরূপেই জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি আমাদের জীবনের অন্ধকার দূর করতে চান। কিন্তু আমরা যদি আমাদের হৃদয় দুয়ার বন্ধ করি, যিশুকে আসতে না দেই তাহলে আমরা আলোর মানুষ হতে পারব না। আমরা আলো দেখতে পারব না।

অন্ধকারে পথ চলছিল যারা, সেই জাতির মানুষেরা দেখেছে এক মহান আলোক। অন্ধকার হচ্ছে পাপ অন্যায় অবিচার, অন্যয্যতার পথ, সেই পথে যারা পড়ে ছিল তারা আজ আশার আলো দেখতে পেয়েছে। আলো হচ্ছে ঈশ্বরের পথ, ন্যয়ের পথ, পবিত্রার ও শান্তির পথ।

পোপ মহদয়ের ঘোষিত সিনোডাল মণ্ডলী অর্থাৎ সহযাত্রী মণ্ডলী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছি। যার মূল প্রক্রিয়া হচ্ছে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ। সহযাত্রী মণ্ডলী হয়ে ওঠার জন্য একসাথে যাত্রা করতে হবে যার মাধ্যমে মিলন, ভালবাসা ও একাত্মতা গড়ে তুলতে হবে যার উৎস হলো ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর। পবিত্র আত্মার শক্তিতে, তাঁরই জ্ঞানে তাড়িত হয়ে প্রত্যেক দীক্ষাস্নাত খ্রিস্টবিশ্বাসীকে মিলন, প্রেরণ দায়িত্ব পালনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসী ভক্তজনগণকে ঐশপ্রেমে, মিলনে, ভালবাসায় ও প্রেরণ-দায়িত্ব পালনে ও জীবন-যাপন করতে অনুগ্রহ দান করেন। তীতের কাছে পত্রে বলা হয়েছে, "কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ও সমস্ত মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি" *(তীত ২:১১)*।

সিনোডাল মণ্ডলী অর্থাৎ সহযাত্রী মণ্ডলী গঠনে আমাদের সবার প্রতি ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। মানব দেহধারি খ্রিস্ট যার মধ্যে রয়েছে ঐশ মহিমা, অনুগ্রহ, ও সত্যের পূর্ণতা, তাঁর সেই পূর্ণতা থেকেই মানুষ লাভ করেছে অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহ লাভের মধ্য দিয়ে মানুষ ফিরে পেয়েছে ঐশসন্তানেত্বের মর্যাদা। খ্রিস্ট মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়ার মাধ্যমে এবং তাঁর কৃপার গুণে তা সম্ভব হয়েছে। খ্রিস্টের সহযাত্রী হয়ে পবিত্র আত্মার কৃপায় ও পিতা ঈশ্বরের অনুগ্রহে জগতের মাঝে গড়ে উঠুক সিনোডাল মণ্ডলী।

গভীর আনন্দের সাথে প্রতিবেশীর সকল পাঠক/পাঠিকা, গুণগ্রাহী ও আপনাদের সবাইকে জানাই **শুভ বড়দিনের** আনন্দময় শুভেচ্ছা ও আসছে **নববর্ষ** আপনাদের জন্য বয়ে আনুক শান্তি ও সফলতা। নতুন বছর আমাদের জীবনকে ভরে তুলুক নতুনত্বে ও সুন্দরে। প্রভুযিশু ও মা মারীয়া আপনাদের সবাইকে নতুন বছরে প্রচুর আশীর্বাদ দান করূন এই প্রার্থনা করি।

বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী
সভাপতি, বিশপীয় সামাজিক কমিশন
ধর্মপাল, খুলনা ধর্মপল্লী

যিশুর শিশু ধ্যান

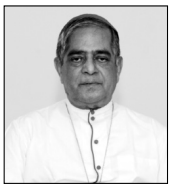

বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি

ছবি: ইন্টারনেট

প্রতিদিন পৃথিবীতে কত শত শিশুর জন্ম হয় যুগ যুগ ধরে; তবুও প্রয়োজন হলো স্বর্গের অনন্তকালীন শিশুর মর্তে মানব শিশু হয়ে জন্ম নিতে, দু'হাজার বছর বেশ পার হয়ে গেল তার পরে; আরও কত যুগ যে পার হবে পরে পরে! বড়দিনে সেই শিশুর জন্ম নিয়ে মহোৎসব মর্তে আমাদের সবার মাঝে, স্বর্গলোকেও উল্লাস স্বর্গদূতদের মাঝে, সমস্ত স্বর্গবাহিনীর মাঝে; আর স্বর্গের এই শিশুটির অনন্তকালীন পিতার অন্তরে উল্লাস স্বর্গ-মর্তের চিরন্তনজাত শিশুটিকে ঘিরে, যিনি তাঁর পুত্র প্রিয়।

বড়দিনে গোশালায় এই ঘটনাটির দৃশ্যমান চিত্র আমাদের ভক্তি প্রকাশের সুন্দর সহজ উপায়। শিশুটি বয়সে-জ্ঞানে, অবশেষে শিক্ষাদানে ও জীবনদানে, সর্বমানবের মুক্তিদাতা হয়ে, জীবনের মহিমা প্রকাশে, ঈশ্বরত্ব প্রকাশে এত বিরাট ব্যক্তিত্ব। তবুও মর্তে তাঁর জন্ম ঘটনা ও মুহূর্তটি গোশালার সবচেয়ে দীন নিঃস্ব দৃশ্যটিতে এসে যেন স্থির হয়ে যায়, আটকে পড়ে যায়। তাঁর জন্মদিনটি আমরা বহু বাহ্যিক গাম্ভির্য দিয়ে পালন করার কথা; কিন্তু বাহ্যিক গাম্ভির্যের সকল অনুভূতি অন্তরের সহজ ভক্তির সামনে মাটি হয়ে যায়। তাঁকে নিয়ে বাহ্যিক গাম্ভির্য কিছুই নয়, অন্তরের নীরব ভক্তিই আসল গভীর বিষয়। তাঁর পরিচয় শেষে গোশালার দীনতার ভক্তিরসে এসে সর্বশ্রেষ্ঠ গভীর ভক্তিভাব লাভ করে। আমরা সবাই জীবনে এত বড় হয়ে গিয়েও মনে হয় না গোশালায় শায়িত যিশু শিশুকে শিশুরূপে সঠিক করে বুঝতে পারি আর।

বড়দিনে গোশালায় যিশুকে দেখা নিয়ে মর্তের কোন এক শিশুর গল্প সর্বদা মনে পড়ে: এই শিশুটি মায়ের কোলে থেকে বা মায়ের হাত ধরে যিশুকে বারে বারে গোশালায় দেখার পর একবার বড়দিনের আগে প্রার্থনা করেছে যেন আসছে বড়দিনে যিশু তাকে একটি খেলনা ঠেলাগাড়ি উপহার দেয়। ছোট শিশুটির এমন প্রার্থনা শুনে মা অনেক অবাক হয়েছে; তবুও বড়দিনে শিশুটির জন্য খেলনা ঠেলাগাড়ি এসে উপস্থিত! আর শিশু মহাখুশী; বড়দিনে সারা সকাল মনের আনন্দে খেলনা ঠেলাগাড়ি নিয়ে বাইরে মজা করে খেলা করছে সে। তবে দুপুর হয়ে এলে তার মা তাকে খুঁজে বাইরে; কিন্তু শিশু আর ঠেলাগাড়ি যে কোথাও নেই। আশে পাশে সকলে সকালে তাকে দেখেছে, তারপরে কোন কিছু জানে না। শেষে কোথাও তার খোঁজ না পেয়ে মা গির্জাতে ফাদারের কাছে আসে; এবং শেষে কথা হয় থানাতে পুলিশকে জানাতে হবে। তবে পুলিশের কাছে যাবার পথে তারা প্রার্থনা করতে গির্জাঘরে যায়। তখন হঠাৎ নিরবতার মধ্যে গির্জার সামনের দিকে তারা কিছু খটখট শব্দ শুনে; আর সামনে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখে তাদের শিশুটি ঠেলাগাড়িতে গোশালার শিশুকে নামিয়ে নিয়ে শুইয়ে রেখে মনের খুশিতে শিশু যিশুকে এদিক সেদিক ঘুরাচ্ছে! তাকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলে যে, তার মা তাকে কত এদিক সেদিক নিয়ে যায়, কিন্তু যিশুর মা যিশুকে কোথাও নিয়ে যায় না, কেবল গোশালায় শুইয়ে রাখে; যিশুর জন্য তার অনেক কষ্ট লেগেছে। তাই গোশালার যিশুর সঙ্গে সে মনে মনে চুক্তি করেছে, "যিশু তুমি বলে কয়ে যদি আমাকে একটি খেলনা ঠেলাগাড়ি এনে দিতে পারো, তবে আমি তোমাকে খুশিমত এখানে সেখানে ঘুরিয়ে আনব!" আজ বড়দিনে সে মহা খুশিতে তা করছে।

শিশু মনের কি অপূর্ব চেতনা শিশু যিশুকে নিয়ে! কী করে মর্তের শিশুটি স্বর্গমর্তের চিরন্তন শিশুর মন এমন করে বুঝতে পেল! শিশুই কেবল যেন শিশুর মন বুঝে! আর যিশুও কীভাবে মর্তের শিশুর এমন শিশু-আদর ফেলতে পারে? তাই যিশুও চিরকাল স্বর্গের গোশালায় আর মর্তের গোশালায় থাকলেন, যেন স্বর্গের পিতা ও মর্তের সব মানবসন্তান তাঁকে শিশু রূপে সর্বদা দেখতে পায় ও চিনতে পায়। শিশু হয়ে না থাকলে যিশু যে নিজেকেও চিনতে পারে না। তাইতো স্বর্গে যিশু পিতার ক্রোড়ে জীবিত শিশু চিরন্তন; মর্তে তিনি মায়ের কোলে নীরব শিশু জীবন!

তাই তো সুসমাচারে আমরা দেখি স্বর্গমর্তের যিশু স্বর্গে যেমন শিশু হয়ে জাত, কর্মময় ও চিরন্তন অবস্থিত, তেমনি মর্তেও তিনি শিশু হয়ে জন্মিত, শিশু হয়ে তার কর্মময় চলাচল আর শিশুর মত হয়ে স্বর্গে তাঁর পুনর্গমন। মর্তে এলে তাঁর অন্তর কেবল "শিশুর মত হয়ে" এদিক সেদিক চলাচল। সুসমাচারে কোন এক খুব সাধারণ মুহূর্তে যিশু বললেন, "শিশুর মত না হয়ে কেউ স্বর্গে যেতে পারে না।" এই কথাটির একটি ব্যাপক রূপ আছে, খুব প্রসারিত ও সর্বজনীন একটি অর্থ আছে; অর্থাৎ স্বর্গমর্তে ইহকালে-পরকালে কেউই "শিশু" না হয়ে আসে না, চলাচল করে না আর চিরকাল অবস্থানও করে না, একমাত্র পিতা ছাড়া যিনি সমস্ত কিছুর উৎস ও কারণ। যিশু এসব কিছুর সংক্ষিপ্তসার করে নিয়ে তাই বলেছেন, "পৃথিবীতে কাউকে পিতা বলে ডেকো না, কেননা পিতা একজনই আছেন যিনি স্বর্গে, পৃথিবীতে তোমরা পরস্পরের ভাই", তথা পৃথিবীতে তোমরা সবাই শিশু, অর্থাৎ সন্তান ও পুত্র-কন্যা, যেমন তিনিও স্বর্গে ও মর্তে।

যিশু নিজেই স্বর্গমর্তে কোথাও কখনও "পিতা" নন; তিনি স্বর্গমর্তে চিরদিন চিরকাল "সন্তান ও পুত্র" তথা "শিশু"।

লেখাটিতে এ পর্যন্ত যিশুকে শিশুর ভাষায় "শিশু" বলে উল্লেখ করা হল; তবে হয়তো বা এখন বড়দের ভাষায় তাঁকে "সন্তান" ও "পুত্র" বলে উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়। তবে সন্তান বা পুত্র হওয়ার ভিতরের আসল রস বা স্বাদ বলতে "শিশু" হয়ে থাকাই বুঝায়।

শিশু, সন্তান বা পুত্র-কন্যা হওয়ার ৪টি ধাপ আমরা লক্ষ্য করি:

একেবারেই প্রথম ধাপে আমরা জাত হয়ে বা জন্ম নিয়ে সন্তান বা পুত্র-কন্যা হই; এ সময়ে আমাদের সন্তান হওয়ার পিছনে সমস্তই পিতা-মাতার কাজ ও পরিশ্রম, আমাদের নিজেদের করার কিছু নেই। আমাদের জন্য তা কেবলই স্বর্গ থেকে ও পিতা-মাতাদের থেকে জীবন "পাওয়া"-র দিক।

দ্বিতীয় ধাপে আমরা দুর্বল হওয়া অর্থে "শিশু" বলে গণ্য হই, তা আমাদের শিশুকাল। আমরা তখন নির্ভরশীল, ধীরে ধীরে পরিপক্কতা লাভের পথে: তখন আমরা অনেক কিছুই পাই, আবার নিজেরাও কিছু কিছু করি; পাওয়ার ও হওয়ার একটা মিশ্রন এই ধাপে।

তৃতীয় ধাপে আমরা বয়স্ক-সবল-পরিপক্ক-দায়িত্ববান হওয়ার পথে; আমরা ধীরে ধীরে স্বকীয় হই। আমরা বড় হয়ে যাই। তবে বড় বয়সে পরিপক্ক ও দায়িত্ববান শিশু বা সন্তান হয়ে থাকতে হলে জন্মদাতা ও আরও অনেকের প্রতি বাধ্য হওয়ার ('শোনার') মধ্যদিয়ে আমরা "সেবক-দাস" হই। তখন বিষয়টি আমাদের জন্য সন্তান ও পুত্র হওয়ার যথার্থ অন্তর-বাহ্যিক শুভ পরিশ্রম। এই ধাপে এসে আমরা অন্তরের দিক থেকে যথার্থভাবে "সন্তান" থাকতেও পারি, আবার কেবল জন্মগত অর্থে নামে মাত্র সন্তান হতে পারি। যিশুর মধ্যে আমরা বাধ্যতায় "পিতার ইচ্ছা পালনের" এরূপ কঠিন আত্মিক পরিশ্রমের মধ্যদিয়ে সন্তান হয়ে থাকা দেখতে পাই। এ ধাপটি হল জন্মগত সন্তান হওয়া থেকে এখন নিজে সেই "সন্তানত্ব অর্জন" করা। এভাবে বাধ্য হয়ে থাকাই বড় হয়ে গিয়েও শিশুর মত থাকা বুঝায়। সকলে বড় হয়ে গিয়ে শিশুর মত হয়ে থাকতে পারে না।

চতুর্থ ধাপটি তৃতীয় ধাপের ফলাফল; তাই তৃতীয় ধাপে নিজ পরিশ্রমে ও যোগ্যতায় সন্তান হয়ে আমরা সেই যোগ্যতার ফল রূপে শেষ ধাপে পিতা-মাতার "প্রিয় সন্তান" হই, নিজের অর্জনে পুত্র বা কন্যা হই। এই ভাবে সন্তান হওয়া কোনমতে ও কোন বয়সে আর শেষ হবে না। যিশু সেই অর্থে পিতার "প্রিয় পুত্র"। আমরাও এই ৪টি ধাপ অনুক্রমে জন্মগত সন্তান, শিশু সন্তান, বাধ্যতার পরিশ্রমে যোগ্য সন্তান এবং শেষে প্রিয় সন্তান ছেলে বা মেয়ে হই আমাদের পরিবারে, আবার বৃহত্তর মানব-পরিবারে।

চারটি সুসমাচারে রয়েছে যিশুকে নিয়ে অনেক কথা: আছে অনাদিকাল থেকে পিতা হতে তাঁর "জাত" হওয়ার কথা, আছে পৃথিবীতে মারীয়ার গর্ভে মানব রূপে তাঁর জন্ম গ্রহণের কথা, আছে মানব রূপে তাঁর বড় হয়ে যাওয়ার কথা, আছে পৃথিবীতে তাঁর প্রকাশিত জীবনে ঈশ্বর ও মানব জীবন নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষার কথা এবং মানুষের রোগ-ব্যাধি দূর করণের ও পাপ ক্ষমা করণের কথা; শেষে আছে তাঁর ক্রুশমৃত্যুর, পুনরুত্থানের ও স্বর্গে আরোহনের কথা এবং নিজেকে রুটি ও দ্রাক্ষারসের সাক্রামেন্তে খাদ্য ও পানীয় রূপে চিরকালের জন্য দান করে যাওয়ার কথা; আর আছে তাঁর পুনরাগমনের কথা।

তবে মানবের জন্য মুক্তি সাধন করার সব ক্রিয়াকলাপের মাঝে যিশুর অন্তর-হৃদয়ে রয়েছে নিজের অন্তর-পরিচয় নিয়ে বিশেষ কথা: তাই সুসমাচারে আছে যিশুর জিজ্ঞাসা: "আমি কে, লোকে কী বলে?", পরপর আবার আছে "আমি কে তোমরা কী বল?" কিন্তু তাতেও লোকদের মুখে বা শিষ্যদের মুখে যিশুর পরিচয় শেষ হয় না, কেননা লোকদের মুখে "যিশু প্রবক্তা" বা শিষ্যদের মুখে "যিশু মোশীহ" বলা হলেও যিশু কাউকে তা বলতে বারণ করে দিলেন "যতদিন না মানবপুত্র ক্রুশমৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান করেন", কেননা কেবল তখনই যিশুর আসল পরিচয় প্রকাশ পাবে, তা মাত্র যিশু নিজে জানেন। তাই বাইরের সাধারণ মানুষেরা বা যিশুর আরও কাছের মানুষ শিষ্যেরা তাঁর পরিচয় যাই বলুক না কেন, শেষে যিশুর কাছেই আসল পরিচয়ের জন্য জিজ্ঞেস করতে হয়, "যিশু, তুমি কে, তুমি নিজেই কী বল?"

আর সুসমাচারে যিশুর মুখে তাঁর অন্তরের পরিচয় কথা ভেসে আসে, "আমি মানব-পুত্র, আমি ঈশ্বর-পুত্র!" আর স্বর্গ-মর্ত জুড়ে আছেন "আমার পিতা, যিনি তোমাদের ঈশ্বর, তিনি তোমাদেরও পিতা"। পৃথিবীতে কোন প্রবক্তা বা নবী, বা ঈশ্বরপ্রেরিত কোন ব্যক্তির অন্তরে নিজের সম্বন্ধে নিজে এমন করে পুত্র হওয়ার এবং ঈশ্বর এমন করে পিতা হওয়ার চেতনা কোথাও নেই। ঈশ্বর কেবল বহু দূরের অনন্তকালীন ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর নন; তিনি সবার খুব কাছের আপন জন, তিনি প্রেমময় পিতা, আমাদের হৃদয়-অন্তরে তাঁর নিবাস।

অনন্তকাল থেকে পিতার জাত পুত্র হয়ে যিশুর অন্তরে কেবলই "পুত্র" হওয়ার ধ্যান। যিশুর অন্তরের শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি ও আনন্দ হল "আমি ঈশ্বর পুত্র, আমি মানব পুত্র"। বিশেষভাবে যোহনের সুসমাচারে আমরা লক্ষ্য করি যে, যিশু বারে বারে বলেন তাঁর সমস্ত কথা ও কাজ, তাঁর সমস্ত জীবনটাই পিতার, তাঁর নিজের বলতে কিছু নেই: শুধুই যেন "পিতা, তুমি আছ; আমি নেই তুমি ছাড়া"। তাঁর আছে শুধু পিতা, তাঁর আছে শুধু পিতার ইচ্ছা পালন করা। পিতার ইচ্ছা পালনই সন্তান বা পুত্র হওয়ার সামর্থ, মাধুর্য ও সৌরভ এবং মহিমা ও গৌরব। তাই দেখতে পাই যোহনের সুসমাচারে ১৭ অধ্যায়ে যিশু পিতার কাছে প্রার্থনা করেন মহিমান্বিত হয়ে থাকতে, কোন বাহ্যিক মহিমার জন্য নয়, বরং ক্রুশমৃত্যু গ্রহণের মধ্যদিয়ে পিতার ইচ্ছা পালনে পিতার সাথে এক হয়ে থাকার মহিমার জন্যে। এভাবেই যিশু পিতার অনন্তকালীন পুত্র ও সন্তান হয়ে থাকলেন। পিতা ও পুত্রে এভাবে এক হয়ে থাকা হল পিতা-পুত্রে প্রেম ও ভক্তি আর "আরাধনা"।

ঈশ্বর হওয়া অর্থে পিতা ও পুত্র সমান; কিন্তু পিতা ও পুত্র হওয়ার সম্পর্কে তাঁরা শুভভাবে অসমান। তেমনি মানবসমাজেও পিতা-মাতা ও সন্তান মানুষ হওয়া অর্থে পরস্পর সমান; তবে পিতা-মাতা ও সন্তান সম্পর্কে শুভভাবে পরস্পর অসমান।

মানব-পুত্র হিসেবেও যিশুর জীবনে সন্তান হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধু পৌলের কথা হিসেবে তিনি নিজ ঈশ্বরত্বে নিঃস্ব হলেন, ঈশ্বরত্ব বর্জন করে নয়, বরং মানব-সন্তান হয়ে ক্রুশমৃত্যুতে মানবেরও আজ্ঞাবহ ও অধীন হয়ে। তিনি মানব-সন্তান হয়ে মৃত্যুবরণ ও পাতাল পর্যন্ত অবরোহন করলেন। এমনিভাবে মানব-সন্তান হয়ে তাঁর জীবনে এলো ক্ষুদ্রতম মানবের প্রতি এক হয়ে তাঁর অন্তরের প্রেম ও ভক্তি এবং "প্রণতি": মানব সকল, আমি মানব-সন্তান, তোমাদেরই সন্তান। তোমরা আছ, আমি নেই আছি শুধু তোমাদের হৃদয়-অন্তরে।

তাই তো যিশু স্বর্গ-মর্তের চিরকালীন শিশু। তাই তো স্বর্গে তিনি জাত শিশু হয়ে পিতার ক্রোড়ে; তাই তো মর্তে যিশু জন্মিত শিশু হয়ে মায়ের কোলে, সর্ব মানবের কোলে।

আমরাও যে পৃথিবীতে আসি স্বর্গীয় পিতার ক্রোড় থেকে, মর্তের মায়ের কোলে জন্ম নিয়ে। মর্তের মায়ের কোলের শিশুকে দেখে মনে হয় না সে বেশী কিছু বুঝে, কেমন যেন কথাবিহীন দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়ে থাকে। তবুও মর্তের শিশু কেমন যেন বুঝে যে, সে গোশালায় শায়িত শিশুর সাদৃশে এসেছে, সেও যে পৃথিবীর অনন্তকালীন শিশু স্বর্গে তার পুনরাগমন অবধি। আমরা সব বড় মানুষেরা সেই অনন্তকালীন শিশু হয়েই মর্তে এসেছি, বড় হয়ে গিয়ে আমরা সেই শিশু-মন হারিয়ে ফেলি; আমরা কি গোশালার শিশুটিকে দেখে, বা আমাদেরই বহু শিশুকে দেখে দেখে আমরা কি আমাদের অন্তরে পুরাতন শিশুটিকে আবার দেখতে পাই; আর দেখে দেখে অন্তরে আবার শিশুর মত হয়ে উঠতে পারি, নিজের শিশু হয়ে থাকাতে মুগ্ধ থাকতে পারি !

বড়দিন: ঈশ্বর ও মানুষের এবং স্বর্গ ও মর্তের মিলন উৎসব

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা

"এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য,
এক পুত্র সন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের,
তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য ভার,
তাঁর নাম রাখা হল 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা',
শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ"
(ইসাইয়া ৯:৫)

বিশ্ব মাতামণ্ডলী যখন সিনডীয় মণ্ডলীর মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ কাজ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, ঠিক তখনি স্বর্গ ও মর্তের মিলন উৎসব-বড়দিন বা প্রভু যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসব আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে ক্ষমা, পুনর্মিলন ও শান্তির মঙ্গলবার্তা নিয়ে। *"নেকড়ে বাঘ মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে, চিতাবাঘ ছাগ শিশুর পাশে শুয়ে থাকবে; বাছুর, যুবসিংঘ ও নধরপশু একসঙ্গে চড়ে বেড়াবে, ছোট একটি বালকই তাদের চালনা করবে (ইসা ১১:৬)"* - আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে প্রবক্তা ইসাইয়া যে মিলন ও শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে সনাতন পিতার পুত্র মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্টের মানব দেহধারণের মধ্যদিয়ে। বড়দিন উৎসবকে তাই বলা যায় ঈশ্বর পুত্রের মানব দেহধারণের উৎসব, স্বর্গ ও মর্তের মিলন উৎসব। আদম হবার পাপের ফলে, যুগে যুগে মনোনীত জাতির অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার ফলে ঈশ্বর ও মানুষের সঙ্গে, স্বর্গ ও মর্তের সঙ্গে এবং মানুষ ও মানুষের মাঝে যে দূরত্ব ও দেয়াল সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়েছে আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা শান্তিরাজ শক্তিশালী ঈশ্বরপুত্রের মানব জন্ম গ্রহণের মধ্যদিয়ে। ঈশ্বরপুত্র মানুষ হয়েছিলেন যেন আমরা দুর্বল পাপী-তাপীজন ঈশ্বরময় হয়ে উঠতে পারি, আমরা যেন অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তাকে স্পর্শ করতে পারি, অন্ধকারের পথ ছেড়ে আলোকিত মানুষ হয়ে উঠতে পারি। ত্রাণকর্তার জন্মের শুভ সংবাদ রাখালদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সময় স্বর্গীয় দূতগণ এই সত্যই প্রকাশ করেছিলেন, *"ভয় পেয়ো না! আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ সমস্ত মানুষের জন্যই সঞ্চিত হয়ে আছে। আজ দাউদের নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন – তিনি সেই খ্রিস্ট, স্বয়ং প্রভু (লুক ২:১০-১১)।"*

বড়দিনের আনন্দ ও তাৎপর্য - ভালবাসা, ক্ষমা ও পুনর্মিলনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের বড়দিন উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এই কথাটি খুব করে বলেছিলেন, "বড়দিন হচ্ছে যিশুখ্রিস্টের মধ্যে মানব দেহধারী ও জন্মগ্রহণকারী ভালবাসার একটি স্মরণ উৎসব। তিনি হলেন মানব জাতির সেই আলো, যিনি অন্ধকারে উদ্ভাসিত; যিনি মানব জাতির অস্তিত্ব ও সমগ্র ইতিহাসকে অর্থপূর্ণ করে তুলেছেন।" পুণ্যপিতা আরো বলেন, "বড়দিন একদিকে আমাদের আহ্বান করে ইতিহাসের ঘটনাবলী অনুধ্যান করতে, যেখানে পাপে ক্ষতবিক্ষত মানব-মানবী বিরামহীন ভাবে সত্য, সুন্দর, ক্ষমা ও মুক্তির পথ খুঁজে বেড়ায়। অন্যদিকে এই বড়দিন উৎসব আমাদের আমন্ত্রণ জানায় পরম পিতার অসীম দয়া ও ভালবাসার চিহ্ন, বেথলেহেমের গোশালায় জন্ম নেওয়া সেই শিশুর দিকে তাকাতে যিনি তাঁর বন্ধুত্ব ও জীবন সহভাগিতার দ্বারা সেই পরম সত্য, সুন্দর, ক্ষমা ও মিলন আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন।" পুণ্যপিতার এই সুন্দর সহভাগিতা আমাদের কাছে এই শিক্ষাই পুনর্ব্যক্ত করে যে, বড়দিন হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের, স্বর্গের সঙ্গে মর্তের এবং মানুষের সাথে মানুষের মিলন মেলা।

বড়দিন বা প্রভু যিশুর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন আমাদের কাছে প্রকাশ করে পরম পিতার অসীম অনুগ্রহ ও ভালবাসাকে, যে ভালবাসা আমাদের জীবন পরিবর্তন করে, যে ভালবাসা মানব ইতিহাসকে নবায়ন করে, যে ভালবাসা মন্দতা থেকে মুক্তি বয়ে আনে, যে ভালবাসা মানব হৃদয়কে শান্তি ও আনন্দে পরিপূর্ণ করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "খৃষ্ট" নামক প্রবন্ধে বড়দিনের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলেছিলেন, "যেদিন সত্যের নামে ত্যাগ করেছি, যেদিন অকৃত্রিম প্রেমে মানুষকে ভাই বলতে পেরেছি, সেই দিনই পিতার পুত্র আমাদের জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেইদিনই বড়োদিন– যে তারিখেই আসুক *(খৃষ্ট, 'বড়োদিন', ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৫০৭-৫০৮)।* সত্যিই তো বড়দিনের প্রকৃত তাৎপর্য ও মাহাত্ম লুকিয়ে আছে ত্যাগের মধ্যে, ভালবাসার মধ্যে, সহভাগিতার মধ্যে যা পবিত্র শাস্ত্রবাণী আমাদেরকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে, *"ঈশ্বর জগতকে এতোই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের কারও যেন বিনাশ না হয়, বরং তারা সকলেই যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন (যোহন ৩:১৬)।"*

মরণ-ভাইরাস করোনার বিষাক্ত ছোবল এবং দেশে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর নানান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিপদগ্রস্ত ও দিশেহারা হয়েও আসুন আমরা সবাই মিলে এবারের বড়দিনের মিলন উৎসবে অংশগ্রহণ করি বেথলেহেমের ছোট শিশুযিশুর সাথে বিশ্বাসে নবজন্ম লাভ করার মধ্যদিয়ে। আমাদের দীনতা, নম্রতা, আত্মত্যাগ, ক্ষমা ও পুনর্মিলনের মধ্যদিয়ে আমরা নিজেরাই হয়ে উঠি বড়দিনের বার্তাবাহক; আমরাই হয়ে উঠি ঈশ্বর ও মানুষ, স্বর্গ ও মর্ত এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের সেতু-বন্ধন। স্বর্গীয় দূতবাহিনীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও সবাই মিলে গেয়ে উঠি–

"জয় ঊর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়!
ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে (লুক ৩:১৪)।"

তথ্যসূত্র:

১। জুবিলী বাইবেল, সাধু বেনেডিক্ট মঠ অনূদিত, সিবিসিবি, ২০০৬।
২। মঙ্গলবার্তা বাইবেল (নবসন্ধি): সজল বন্দোপাধ্যায় ও খ্রীষ্টিয়া মিংগো, এস জে অনূদিত, আর্চবিশপ ভবন, কলকাতা, ২০১৮।
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: খৃষ্ট 'বড়োদিন', রবীন্দ্র রচনাবলী ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৫০৭-৫০৮, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৭৪।
৪। কর্তে মারিস: "বড়দিন উপলক্ষে পোপ ফ্রান্সিসের বাণী", কাথলিক নিউজ এজেন্সি, ভাতিকান সিটি, ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ॥

বড়দিন উদ্‌যাপন অনুচিন্তন: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কিছু আজানা কথা

ফাদার লেনার্ড রিবেরু

সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে উৎসব হলো মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। উৎসব যেমন মানুষের জীবনকে ব্যস্ত করে তোলে তেমনি ব্যস্ততা থেকে মুক্তির উপায়ও খুঁজে দেয়। উৎসব যাই হোক, যে ধরনেরই হোক না কেন প্রত্যেকটি উৎসবের কিছু সাধারণ এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। উৎসবে মানুষ প্রতিদিনকার ব্যস্ততা দূরে সরিয়ে রেখে আনন্দে মেতে উঠে। পৃথিবীর বেশিরভাগ উৎসবের সঙ্গে কোনো না কোনো ধর্মের সংযোগ থাকলেও বলা হয় ধর্ম যার যার উৎসব সবার। আনন্দের যেমন কোন ধর্ম নেই, তেমনি উদ্‌যাপনেরও কোন ধর্ম হয় না। পৃথিবীতে এমন কিছু উৎসব রয়েছে যেগুলোর উদ্‌যাপনকালে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে মানুষ জাতি-ধর্ম ভুলে একই দিনে একই সাথে আনন্দে মেতে উঠে। খ্রিস্টান ধর্মের উৎসব বড়দিন সেক্ষেত্রে অন্যতম। প্রতিবছর ২৫ ডিসেম্বর বিশ্ব জুড়ে এই দিনটি পালিত হয়। বড়দিন বা ক্রিস্টমাস নামেই উৎসবটি পরিচিত।

বড়দিনের ইতিহাস: যদিও বড়দিন যিশুর জন্মতিথি ২৫ ডিসেম্বর নির্ধারিত এবং পালিত তবে এই তারিখেই যে যিশুর জন্ম সে ব্যাপারে কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। ২৫ ডিসেম্বর নির্ধারণের কিছু প্রেক্ষাপট-ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে। ২২১ খ্রিস্টাব্দে মিশরের দিন পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, মারীয়া ২৫ মার্চ গর্ভধারণ করেন। ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত গাব্রিয়েল দূত কুমারী মেয়ে মারীয়ার কাছে আসেন এবং শুভ বার্তা জানান যে ঈশ্বর-পুত্র যিশু তাঁর গর্ভে জন্ম নিবে পবিত্র আত্মার প্রভাবে (*লুক ১:২৬-৩৮*) সেই মোতাবেক ৯ মাস পর ২৫ ডিসেম্বর যিশুর জন্মগ্রহণ- সে ধারণা থেকে ২৫ ডিসেম্বর যিশুর জন্মদিন পালন করা একটা কারণ হতে পারে। তাছাড়া ৩৩৬ খ্রিস্টাব্দ হতে রোমান বর্ষপুঞ্জিতে ২৫ ডিসেম্বরকে বড়দিন হিসেবে উদ্‌যাপনের নিদের্শনা দেয়া হয় বলে জানা যায়। রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ফলে দিনে দিনে বড়দিন প্রাণ পেতে শুরু করে। দিন ও তারিখের মতভেদ থাকলেও যিশু খ্রিস্টের মাহাত্ম্য স্বমহিমায় উজ্জ্বল। পশ্চিমা চার্চে খ্রিস্টের জন্ম উদ্‌যাপনের সবচেয়ে প্রাচীন রেকর্ডটি ৩৫৪টি রোমান ক্রোনোগ্রাফে, যা 'Phyllocalism' ক্যালেন্ডার নামেও পরিচিত। এই ইয়ারবুক রেকর্ড করে যে ৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে রোমান চার্চ খ্রিস্টের জন্মের স্মরণে একটি ভোজ উদ্‌যাপন করেছিল। ইতিহাস অনুযায়ী ৩৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পোপ জুলিয়াস প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন ২৫ ডিসেম্বর পালন করার জন্য ঘোষণা দেন। সেই থেকে দেশে দেশে এই দিনটি পালন হয়ে আসছে। অন্য তথ্য মতে এটি একটি ঐতিহাসিক রোমান উৎসব। পবিত্র বাইবেলে যিশুর জন্মদিন সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু উল্লেখ নেই। এর ইতিহাস জানতে যেতে হবে যিশুর জন্মের আগে মানব সভ্যতার গোড়ার দিকে। রোম সাম্রাজ্যে সবচেয়ে বড় উৎসব ছিল তাদের কৃষি দেবতার ও গ্রহের সম্মানে এক বিশেষ উৎসব। এই উৎসব শীতের মাঝামাঝি সময়ে ২৫ ডিসেম্বরের দিকে পালিত হতো। মিথ্রা বা সূর্য দেবতার পূজা উৎসব খুব ঘটা করে জাঁক-জমক সহকারে পালন করা হতো যা ছিল আলোর উৎসব অর্থাৎ সূর্য বড় দেবতা কেননা অন্ধকার সূর্যের আলোর কাছে টিকতেই পারেনা। আলোর এই উৎসব বা সূর্য দেবতার উৎসব বিজাতিরা ২৫ ডিসেম্বর পালন করা শুরু করল। খ্রিস্টানদের জন্য সূর্য দেবতার স্থান করে নিল যিশু এবং উৎসবটি নতুন অর্থ পেল। যখন সূর্য উঠে তখন প্রকৃতি আলোকিত হয়, সবকিছু স্বচ্ছ দেখায়, উজ্জ্বলরূপ ধারণ করে। একইভাবে যিশুর জন্মে আমাদের জীবনের অন্ধকার, হতাশা, গ্লানি ও পাপময়তা দূর হয়ে যায়। এসব সত্য অন্তর্নিহিত অর্থ ও বিশ্বাসের গভীরতা উপলব্ধি করে ২৫ ডিসেম্বরকে যিশুর জন্মদিন রূপে বেছে নেয়া হয়েছে। তাহলে যা ছিল বিজাতিদের উৎসব তাই তখন হয়ে গেল খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব।

শব্দগত বুৎপত্তি: ইংরেজী খ্রিস্টমাস (*Christmas*) শব্দটি। খ্রিস্টের মাস (উৎসব) যুগ্ম অর্থ থেকে উৎসারিত। শব্দটির বুৎপত্তি ঘটে মধ্য ইংরেজি *Christemasse* ও আদি ইংরেজী Crister maesse শব্দ থেকে। শেষোক্ত শব্দটির প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দের একটি রচনায়। "*Crister*" শব্দটি আবার গ্রীক "*Christos*" এবং "*maesse*" শব্দটি ল্যাটিন *missa* (পবিত্র উৎসব) শব্দ থেকে উদ্‌গত প্রাচীন গ্রীক ভাষায় X (টি) হল Christ বা খ্রিস্ট শব্দের প্রথম অক্ষর। এই অক্ষরটি ল্যাটিন অক্ষর X এর সমরূপ। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তাই এই অক্ষরটি খ্রিস্ট শব্দের নাম সংক্ষেপ হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়। এই কারণে *Christmas* এর নাম সংক্ষেপ হিসাবে X-mas কথাটি চালু হয়।

কেন বড়দিন! একাডেমী বিদ্যার্থী বাংলা অভিধানে যিশু খ্রিস্টের জন্মোৎসব উৎসবটিকে বাংলায় বড়দিন আখ্যা দেওয়ার কারণটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে; ২৩ ডিসেম্বর থেকে দিন ক্রমশ বড়ো এবং রাত ছোট হতে আরম্ভ করে। দিনটিকে বাংলায় "বড়দিন" নামকরনের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, "মর্যাদার দিক থেকে এটি একটি বড়দিন।" যিশু যেহেতু বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য ধর্ম ও দর্শন দিয়ে গেছেন, বিশ্বব্যাপী বিশাল অংশের মানুষ তাঁর দেয়া ধর্ম ও দর্শনের অনুসারি। যিনি এত বড়ো ধর্ম ও দর্শন দিলেন ২৫ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন; সে কারণেই এই দিনকে বড়দিন হিসেবে বিবেচনা করে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ।"

আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাস মতে বড়দিন হল ঈশ্বরের দেহধারণ; মানুষ হয়ে এজগতে তাঁর জন্ম মানুষেরই গর্ভে। তাহলে যিনি সবার বড়, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর জন্মদিন হলো বড়দিন। যিনি সবকিছুর উর্ধ্বে, যিনি সবার বড় অর্থাৎ মহান, তিনি মানব ধরাতলে জন্ম নিয়ে আমাদের সবাইকে মহান করে তুলতে চান। Christmas শব্দটি বাংলা অনুবাদ বড়দিন: অনুবাদটি যথার্থ হয়নি, কেননা দিন তো আসলে তো ছোট; তবে কে, কিভাবে, কি ভেবে এই অর্থ দিয়েছেন জানা নেই তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় অর্থটি যথার্থ-ই হয়েছে কেননা যিনি সবার বড় তাঁর জন্মদিন তো বড়দিনই।

বড়দিনের স্যান্তাক্লজ: অনেক দিন আগে তুরস্কে সেন্ট নিকোলাস নামে একজন ধর্মগুরু ছিলেন। সেন্ট নিকোলাস নাম থেকেই মূলত সান্তা ক্লজ নামের উৎপত্তি। নিকোলাস তার সব সম্পত্তি গরিবদের দান করে দিয়েছিলেন। ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছিলেন তিনি। তাই অনাথ শিশুদেরও তিনি খুব ভালোবাসতেন। রাতের আকাশে যখন অর্ধেক চাঁদ থাকত তখন তিনি উপহার নিয়ে বের হতেন। এতে করে কেউ তাকে চিনতে পারত না। মোজা ঝোলানো নিয়েও রয়েছে এক গল্প। এক ব্যক্তি টাকার অভাবে তার তিন মেয়েকে বিয়ে দিতে পারছিলেন না। এ কথা জানতে

পেরে নিকোলাস গোপনে তাকে সাহায্য করার চিন্তা করেন। ওই ব্যক্তি সেদিন ছাদে মোজা শুকাতে দিয়েছিলেন। নিকোলাস ছাদে উঠে সেই মোজার মধ্যে সোনার মুদ্রা রেখে দেন। একবার নয়, তিনবার এভাবে সোনা রাখার জন্য যান তিনি। শেষবার সেই ব্যক্তি নিকোলাসকে দেখে ফেলেন। নিকোলাস তার সাহায্যের কথা কাউকে জানাতে নিষেধ করেন। কিন্তু এ ঘটনার কথা চাপা থাকে না, ধীরে ধীরে তা তুরস্ক ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে সব দেশে। এরপর থেকেই মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্ম নেয় যে বড়দিনে মোজা ঝুলিয়ে রাখলে সান্তা ক্লজ এসে তাতে উপহার রেখে যান।

খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী শিশুরা বিশ্বাস করে, যেসব শিশু সারা বছর বাবা-মায়ের কথা শোনে, লক্ষ্মী হয়ে থাকে, বড়দিনের আগের রাতে সান্তা ক্লজ তাদের উপহার দিয়ে যান। এ জন্য এই রাতে তারা ঘরের যেকোনো জায়গায় মোজা ঝুলিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যায়। সকালে উঠে তারা দেখে মোজার ভেতরে রয়েছে সুন্দর কোনো উপহার। আসলে শিশুদের মা-বাবা বা আপনজনেরা তাদের জন্য এসব উপহার রেখে দেন। রাতের এই সান্তাকে বাস্তবে দেখা না গেলেও বড়দিনের উৎসবে বিভিন্ন স্থানে কিন্তু সান্তা ক্লজকে দেখা যায়। বিভিন্ন হোটেল, রেস্টুরেন্ট বা বিনোদন পার্কে বড়দিনের উৎসবে দেখা মেলে মুখভর্তি সাদা দাড়ি-গোঁফ, পরনে লাল-সাদা আলখেল্লা, টুপি, চামড়ার বেল্ট ও বুট জুতা পায়ে সান্তা ক্লজের। সান্তা ক্লজ শিশুদেরকে কেক, চকলেট, খেলনা ইত্যাদি উপহার দিয়ে থাকেন।

কেন ক্রিসমাস পালন করা হয়?

ভারতবর্ষে প্রথম ক্রিসমাস পালন করা হয় ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে। জব চার্নক প্রথম বড়দিন পালন শুরু করেছিলেন বলে শোনা যায়। সূর্যের উত্তরায়ণ শেষ হয়ে শুরু হয় দক্ষিণায়ন। এদিন থেকে বেলা একটু একটু করে বড় হয়। সেই সঙ্গে শীতের প্রকোপও কমতে শুরু করে। এছাড়াও বিশ্বাস এই দিনেই যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছিল বিশ্ব। যে কারণে সবাই একে অপরকে উপহার দিয়ে আনন্দের সঙ্গে দিনটি পালন করেন। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন পালন করা হলেও ব্যতিক্রম রাশিয়া, জর্জিয়া, মিশর, আর্মেনিয়া। জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ৭ জানুয়ারি এখানে বড়দিন পালন করা হয়। প্রায় ২০০০ বছর আগে পৃথিবীর মানুষকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখিয়েছিলেন যিশু। বড়দিনে তাই খ্রিসমাস ক্যারল, মোমবাতি, উপহারে তাঁকেই স্মরণ করে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা।

বড়দিন উদ্‌যাপনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব: সামাজিক গুরুত্ব-এর পাশাপাশি ক্রিসমাস বা বড়দিন উদ্‌যাপনের বিশেষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। বাঙালির দুর্গাপূজা কে কেন্দ্র করে যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের জীবন ও জীবিকা নির্ধারণ করে, তেমনি বড়দিন বা ক্রিসমাস পালনের উপর নির্ভর করেও বিশ্বের অসংখ্য মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ধারিত হয়। এই দিন উপলক্ষে পৃথিবীর সকল পাইকারি ও খুচরা বাজারে কেনাবেচার পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। মানুষ বড়দিন উপলক্ষে ঘর সাজানোর দ্রব্য এবং উপহার সামগ্রী এবং উপহার সামগ্রী কেনে বলে এই সময়ের পূর্বে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বাজারে আসে। একটি সমীক্ষায় জানা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বড়দিনের আগে আগেই বাজারের আসন্ন ভিড় সামলানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে কর্মী নিয়োগ করা হয়। এছাড়া বড়দিনের শুভেচ্ছা প্রেরণের কার্ড তৈরির উদ্দেশে বিভিন্ন কাগজের কারখানাতেও কর্মী নিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

বড়দিনের বৃক্ষ, বড়দিনের আলোকসজ্জা, বড়দিনের মোজা ও বড়দিনের গহনা

বড়দিন উপলক্ষে বিশেষ ধরনের সাজসজ্জার ইতিহাসটি অতি প্রাচীন। প্রাক-খ্রিস্টীয় যুগে, রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসী শীতকালে চিরহরিৎ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা বাড়ির ভিতরে এনে সাজাত। খ্রিস্টানরা এই জাতীয় প্রথাগুলিকে তাদের দৃজ্যমান রীতিনীতির মধ্যে স্থান দেয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর লন্ডনের একটি লিখিত বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই সময়কার প্রথানুসারে বড়দিন উপলক্ষে প্রতিটি বাড়ি ও সকল গ্রামীণ গির্জা হোম, আইভি ও বে এবং বছরের সেই মরসুমের যা কিছু সবুজ, তাই দিয়েই সুসজ্জিত করে তোলা হত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, হৃদয়াকার আইভিলতার পাতা মর্তে যিশুর আগমনের প্রতীক; হলি প্যাগান (অখ্রিস্টান পৌত্তলিক) ও ডাইনিদের হাত থেকে রক্ষা করে; এর কাঁটার ক্রুশবিদ্ধকরণের সময় পরিহিত যিশুর কন্টকমুকুট এবং লাল বেরিগুলি ক্রুশে যিশুর রক্তপাতের প্রতীক। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে রোমে নেটিভিটি দৃশ্য প্রচলিত ছিল। ১২২৩ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসি এগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এরপর শীঘ্রই তা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র খ্রিস্টান বিশ্বে স্থানীয় প্রথা ও প্রাপ্ত দ্রব্যাদির অনুষঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সাজসজ্জার প্রথা চালু রয়েছে। ১৮৬০-এর দশকে শিশুদের হাতে নির্মিত কাগজের শিকলের অনুপ্রেরণায় বড়দিনের প্রথম বাণিজ্যিক সজ্জা প্রদর্শিত হয়।

ক্রিসমাস ট্রি: বড়দিনে ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর রেওয়াজ হাজার বছরের পুরনো। উত্তর ইউরোপে সে আমলে ফারগাছ বা চেরিগাছকে আলো দিয়ে সাজানো হতো। আস্তে আস্তে এই রীতি ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। আজকাল আমাদের দেশের খ্রিস্টানরাও বড়দিনে আলোয় আলোয় সাজিয়ে তোলেন ক্রিসমাস ট্রি। বড়দিনের বৃক্ষ ও চিরহরিৎ শাখাপ্রশাখার ব্যবহার দক্ষিণ অয়নান্তকে ঘিরে প্যাগান প্রথা ও অনুষ্ঠানগুলির খ্রিস্টীয়করণের ফলশ্রুতি; এক ধরনের প্যাগান বৃক্ষপূজা অনুষ্ঠান থেকে এই প্রথাটি গৃহীত হয়েছিল। ইংরেজি ভাষায় "Christmas tree" শব্দটির প্রথম লিখিত উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। শব্দটি গৃহীত হয়েছিল জার্মান ভাষা থেকে। মনে করা হয়, আধুনিক বড়দিনের বৃক্ষের প্রথাটির সূচনা ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মানিতে। যদিও অনেকের মতে, এই প্রথাটি ষোড়শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার চালু করেছিলেন। প্রথমে তৃতীয় জর্জের স্ত্রী রানি শার্লোট এবং পরে রানি ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে আরও সফলভাবে প্রিন্স অ্যালবার্ট জার্মানি থেকে ব্রিটেনে এই প্রথাটির আমদানি করেন। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বড়দিন বৃক্ষের প্রথাটি সমগ্র ব্রিটেনে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। ১৮৭০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণও বড়দিনের বৃক্ষের প্রথাটি গ্রহণ করে। বড়দিন বৃক্ষ আলোকসজ্জা ও গহনার দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

প্রথাগত বড়দিনের সজ্জা : অস্ট্রেলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইউরোপে বাড়ির বাইরে আলোকসজ্জা, এবং কখনও কখনও আলোকিত স্লেজ, স্নোম্যান, ও অন্যান্য বড়দিনের চরিত্রের পুতুল সাজানোর প্রথা রয়েছে। পুরসভাগুলিও এই সাজসজ্জার পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। রাস্তার বাতিস্তম্ভে বড়দিনের ব্যানার লাগানো হয় এবং টাউন স্কোয়ারে স্থাপন করা হয় বড়দিনের বৃক্ষ। পাশ্চাত্য বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মীয় খ্রিস্টমাস মোটিফ সহ উজ্জ্বল-রঙা রোল করা কাগজ উৎপাদিত হয় উপহারের মোড়ক হিসেবে ব্যবহারের জন্য। এই মৌসুমে অনেক গৃহে খ্রিস্টমাস গ্রামের দৃশ্যরচনার প্রথাও লক্ষিত হয়। অন্যান্য প্রথাগত সাজসজ্জার অঙ্গ হল ঘণ্টা, মোমবাতি, ক্যান্ডি ক্যান, মোজা, রিদ ও স্বর্গদূতগণ। অনেক দেশে নেটিভিটি দৃশ্যের উপস্থাপনা বেশ জনপ্রিয়। এই সব দেশে জনসাধারণকে সম্পূর্ণ এবং বাস্তবসম্মত নেটিভিটি দৃশ্য সৃজনে উৎসাহিত করা হয়। কোনো কোনো পরিবারে যেসকল দ্রব্য বা পুতুল দিয়ে এই দৃশ্য রচিত হয়, সেগুলিকে উত্তরাধিকার সূত্রে মূল্যবান পারিবারিক সম্পত্তি মনে করা হয়। ৫ জানুয়ারির পূর্বসন্ধ্যায় দ্বাদশ

রজনীতে খ্রিস্টমাস সাজসজ্জা খুলে নেওয়া হয়। খ্রিস্টমাসের প্রথাগত রংগুলি হল পাইন সবুজ (চিরহরিৎ), তুষার ধবল ও হৃদয় রক্তবর্ণ।

সঙ্গীত ও ক্যারোল: প্রাচীনতম যে বিশেষ খ্রিস্টমাস স্তোত্রবন্দনাগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি রচিত হয়েছিল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর রোমে। মিলানের আর্চবিশপ অ্যামব্রোস রচিত Veni redemptor gentium ইত্যাদি লাতিন স্তোত্রগুলি এরিয়ানিজম বিরোধী যিশুর অবতারবাদের ধর্মীয় তত্ত্বকথার পবিত্র ভাষ্য। স্প্যানিশ কবি প্রুডেন্টিয়াস (মৃত্যু ৪১৩ খ্রিস্টাব্দ) রচিত Corde natus ex Parentis (Of the Father's love begotten) স্তোত্রটি আজও কোনো কোনো গির্জায় গীত হয়। নবম ও দশম শতাব্দীতে উত্তর ইউরোপের খ্রিস্টীয় মঠগুলিতে বার্নার্ড অফ ক্লেয়ারভক্স কর্তৃক ছন্দায়িত স্তবকে সজ্জিত হয়ে খ্রিস্টমাস সিকোয়েন্স বা প্রোজ প্রচলিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে পেরিসিয়ান সন্ন্যাসী অ্যাডাম অফ সেন্ট ভিক্টর জনপ্রিয় গানগুলি থেকে সুর আহরণ করে প্রথাগত খ্রিস্টমাস ক্যারোলের মতো এক প্রকার সঙ্গীত সৃষ্টি করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স, জার্মানি, এবং বিশেষ করে ফ্রান্সিস অফ আসিসির প্রভাবাধীন ইতালিতে আঞ্চলিক ভাষায় জনপ্রিয় খ্রিস্টমাস সঙ্গীতের একটি শক্তিশালী প্রথা গড়ে ওঠে। ইংরেজি ভাষায় প্রথম খ্রিস্টমাস ক্যারোল পাওয়া যায় চ্যাপলেইন জন অডেলের রচনায়। তাঁর তালিকাভুক্ত পঁচিশটি ক্যারোলস অফ ক্রিসমাস ওয়েসেলারদের দল বাড়ি বাড়ি ঘুরে গেয়ে শোনাত। যে গানগুলিকে আমরা খ্রিস্টমাস ক্যারোল বলে জানি, আসলে সেগুলি ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংগীত। বড়দিন ছাড়াও 'হারভেস্ট টাইড' উৎসবেও সেগুলি গাওয়া হত। পরবর্তীকালে গির্জায় ক্যারোল গাওয়ার সূচনা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে ক্যারোল মধ্যযুগীয় কর্ড প্যাটার্নে সুরারোপিত হয়ে থাকে। এই কারণে এই গানগুলির সুর বেশ স্বতন্ত্র ধরনের হয়ে থাকে। "Personent hodie",Good King Wenceslas", এবং The Holy and the Ivy" ক্যারোলগুলি মধ্যযুগের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত। এখনও গীত হয় এমন প্রাচীনতম গানগুলির অন্যতম এগুলি। Adeste Fidelis (O Come all ye faithful) ক্যারোলটি তার বর্তমান রূপটি পরিগ্রহ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে; যদিও গানটির কথা সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ সংস্কারক চার্লস উইজলি উপাসনায় সঙ্গীতের প্রয়োজনীতা অনুধাবন করেন। তিনি একাধিক সামে সুরারোপ করেছিলেন। এগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাজাগরণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়াও তিনি অন্তত তিনটি খ্রিস্টমাস ক্যারোলের বাণী রচনা করেন। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ক্যারোলটির আদি শিরোনাম ছিল "Hark! How All the Welkin Rings"; বর্তমানে গানটির শিরোনাম "Hark! the Herald Angels Sing". ফেলিক্স মেন্ডেলসন উইজলির কথার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ একটি সুরও রচনা করেছিলেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ায় মোর ও গ্রুবার এই সংগীতধারায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ওবার্নডর্ফের সেন্ট নিকোলাস চার্চের জন্য তারা রচনা করেছিলেন "Silent Night" ক্যারোলটি। উইলিয়াম বি. স্যান্ডিজ রচিত ক্রিসমাস ক্যারোল এনসিয়েন্ট অ্যান্ড মডার্ন (১৮৩৩) গ্রন্থে একাধিক নব্য-ধ্রুপদি ইংরেজি ক্যারোল প্রথম প্রকাশিত হয়। এগুলি ভিক্টোরিয়ান যুগের মধ্যভাগে উৎসবের পুনরুজ্জীবনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

কার্ড: খ্রিস্টমাস কার্ড হল এক প্রকারের চিত্রিত শুভেচ্ছাবার্তা। সাধারণত বড়দিনের পূর্বের সপ্তাহগুলিতে বন্ধুবান্ধব ও পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে খ্রিস্টমাস কার্ড আদান-প্রদান চলে। এই চিরাচরিত শুভেচ্ছাবার্তার বাণীটি হল পবিত্র খ্রিস্টমাস ও শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ("wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year")। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত স্যার হেনরি কোল নির্মিত প্রথম বাণিজ্যিক খ্রিস্টমাস কার্ডের বাণীটিও এই প্রকারই ছিল। যদিও এই শুভেচ্ছাবার্তা রচনার বহুতর পন্থা বিদ্যমান। অনেক কার্ডে একদিকে যেমন ধর্মীয় অনুভূতি, কবিতা, প্রার্থনা বা বাইবেলের স্তব স্থান পায়, তেমনই অন্যদিকে "সিজন'স গ্রিটিংস"-এর মতো কার্ডগুলি ধর্মীয় চেতনার বাইরে সামগ্রিক ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। বড়দিন উৎসব সম্পর্কিত চিত্রকর্ম সংবলিত বা বাণিজ্যিকভাবে নকশাকৃত মৌসুমের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতাযুক্ত খ্রিস্টমাস কার্ডের বিক্রির পরিমাণ যথেষ্টই। কার্ডের নকশায় স্থান পায় যিশুর জন্মদৃশ্য-সংবলিত খ্রিস্টমাসের বর্ণনা অথবা বেথলেহেমের তারা বা পবিত্র আত্মা ও বিশ্বে শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা ইত্যাদি খ্রিস্টীয় প্রতীক। ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়কেন্দ্রিক কার্ডগুলিতে খ্রিস্টমাস সংস্কারের নানা দৃশ্য, সান্তাক্লজ প্রভৃতি খ্রিস্টমাস চরিত্র, বা বড়দিনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মোমবাতি, হলি ও বাবল, শীত ঋতুর নানা চিত্র, খ্রিস্টমাসের নানা প্রমোদানুষ্ঠান, তুষারদৃশ্য ও উত্তরদেশীয় শীতের জন্তুজানোয়ারের ছবি স্থান পায়। এছাড়াও পাওয়া যায় হাস্যরসাত্মক কার্ড এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর পথেঘাটে ক্রিনোলাইন দোকানদারদের চিত্রসংবলিত নস্টালজিক কার্ডও।

খ্রিস্টমাস ডাকটিকিট: অনেক দেশেই বড়দিন উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়। ডাক ব্যবহারকারীরা খ্রিস্টমাস কার্ড পাঠানোর সময় এই ডাকটিকিটগুলি ব্যবহার করে থাকেন। ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের কাছেও এগুলি খুব জনপ্রিয়। খ্রিস্টমাস সিল ও মাত্র এক বছরের বৈধতা ছাড়া এগুলি সাধারণ ডাকটিকিটের মতোই হয়ে থাকে। এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ছাপা হয় এবং অক্টোবরের সূচনা থেকে ডিসেম্বরের সূচনা পর্যন্ত এই ডাকটিকিট বিক্রি হয়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইম্পিরিয়াল পেনি পোস্টেজ হারের উদ্বোধন উপলক্ষে একটি কানাডিয়ান ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছিল। এই ডাকটিকিটে বিশ্বের একটি মানচিত্রের তলায় "XMAS ১৮৯৮" কথাটি খোদিত ছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়া গোলাপ ও জোডিয়াক চিহ্ন সংবলিত দুটি "ক্রিসমাস গ্রিটিংস স্ট্যাম্প" প্রকাশ করে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিল চারটি অর্ধ-ডাকটিকিট প্রকাশ করে; এগুলির বিষয় ছিল: তিন রাজা ও বেথলেহেমের তারা, স্বর্গদূত ও শিশু, দক্ষিণী ক্রুশ ও শিশু, এবং এক মা ও শিশু। যুক্তরাষ্ট্র ডাক পরিষেবা ও রয়্যাল মেল উভয়েই প্রতি বছর খ্রিস্টমাস-বিষয়বস্তু সংবলিত ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

বড়দিনের অনুচিন্তন: বড়দিনের ঘটনাটি সামান্য, সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করে, নগন্য বস্তুকে কেন্দ্র করে, ক্ষুদ্র স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ঈশ্বর তাঁর অসামান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার বরেছেন সামান্যদেরকে। বড়দিনের গল্প/ঘটনা আমাদের সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের ঈশ্বর আজ হয়তো নতুন করে অনুপ্রাণিত করেছেন যেন সামান্য হিসেবে আমরা তাঁর পরিকল্পনার অংশীদার হবার জন্য প্রস্তুত হতে পারি। ঈশ্বর পিতা তাঁর পুত্রকে জগতে পাঠিয়েছিলেন তাঁর পরিকল্পনা পুনরুদ্ধার করতে; যা তিনি এখনো করে যাচ্ছেন আমাদের সাথে-আমাদের মধ্যদিয়ে। প্রতি বড়দিনেই ঈশ্বর আমাদের খুঁজেন। যারা সামান্য, ক্ষুদ্র, সাধারণ, নগণ্য যেন তাদের তিনি ব্যবহার করতে পারেন তাঁর অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য। যদি আমার কাছে ৫টি রুটি আছে সেটা তাঁকে দেই, দুটি মাছ থাকলে সেটাও দেই,

যদি আমার শিক্ষা থাকে, বিত্ত-বৈভব থাকে তাহলে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলি, এই আমি, আমাকে তোমার ইচ্ছামত ব্যবহার কর। যদি পান্থশালা থাকে তা ঈশ্বরের জন্য খুলে দেই। যদি গাধা থাকে সেটাও দেই যেন যিশু সেটা ব্যবহার করতে পারেন। যদি আমার সঞ্চয়ে জটামাংসের তেল থাকে যিশুর জন্য তা ব্যবহার করি, যদি অবশিষ্ট সিকি থাকে, সেটাও যিশুর হাতে তুলে দিয়ে বলি যিশু ব্যবহার কর। যদি জাল থাকে তা-ও যিশুকে দেই, নৌকা থাকলে নৌকাও যিশুকে দেই তিনি তা ব্যবহার করতে পারবেন।

আমার কি খুবই সামান্য কিছু আছে, আমি কি ক্ষুদ্র জায়গা থেকে এসেছি, আমি কি খুবই সাধারণ কেউ? নিজেকে দিয়ে দেই ঈশ্বরকে এবং বিশ্বাস করি যে, তিনি আপনাকে/আমাকে ব্যবহার করবেন তাঁর আশ্চর্য পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। তিনি পারেন এবং তিনি তা করেন।

বড়দিনের আধ্যাত্মিকতা মিলনের, বড়জনকে তাদের মত করে ক্ষুদ্রজনের মাঝে পাওয়া। ঈশ্বরের এই যে মানুষ হওয়া, মানুষের সঙ্গে একাত্মতা, এই যে তাঁর উর্ধ্ব থেকে নিম্নে নেমে আসা- এতো পৃথিবীর দীনহীনজনের সাথে বৃহত্তর ঐশ্বসত্তার মহামিলন। মর্তের সাথে স্বর্গের এক মহামিলন। এই মহামিলনের তিনি হলেন প্রকাশিত-পরিচিতি-প্রতিবেশি একদম কাছে।

বড়দিন প্রভু যিশুর শুভ জন্মদিন। রাজাধিরাজের জন্ম গোয়ালঘরে এতো এক মহালীলা। তাই ঈশ্বর পুত্রের এই জন্মলীলার স্মরণ উৎসব যথার্থই বড়দিন। যিশুর জন্মের মুহূর্তটাও স্বাভাবিক নিয়মের নয়। যিশুর জন্মে উৎসব করেছে স্বর্গদেবতারা, আকাশের তারারা, মাঠের রাখালেরা, আর উৎসব করেছে দূর দেশের পণ্ডিতেরা। রাতের সেই ঘুমন্ত পৃথিবীর মধ্যে মর্ত ও স্বর্গবাসীর মহামিলন উৎসব নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা নয়। বড়দিন এক মহান দিন বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন, খ্রিস্টানদের মহাউৎসবের দিন। এই উৎসব বিশ্বাসের উৎসব, এই উৎসব ক্ষমার উৎসব, এই উৎসব আনন্দ সহভাগিতার উৎসব। কেননা তার জন্মে শুরু হলো মানুষের সাথে ঈশ্বরের মিলন। তাই ভাই-বোনেরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, উচুঁ-নিচু, ধনী-গরীব, ছোট-বড়, ভেদাভেদ ভূলে মিলি সবে একতার বন্ধনে। আনন্দ করি, করি উল্লাস, হাসি-আনন্দে মাতি সবে ত্রাণকর্তার জন্মতিথিতে মহা মিলনের এই উৎসবে।

বড়দিন শুভ সংবাদ: বড়দিন বা যিশুর জন্মোৎসব এক শুভবাণী: নতুন সংবাদ: আনন্দময় সংবাদ। এই সংবাদ হলো ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন। আমরা যেমন ঠিক তেমনটি করে ভালোবাসেন আর তাইতো তিনি আমাদের মাঝে বাস করেন। বড়দিন হলো মানুষের মাঝে মানুষের মতো হয়ে ঈশ্বরের আগমন। ঈশ্বর আজ আমাদের বেছেনিলেন। যিশুর দেহ ধারণ নিচে নেমে আসা কোন পরাজয় বা অপমান নয় বরং তা হলো মানুষকে উন্নতি ও তাকে ভগবৎ করার উপায়।

বড়দিন প্রতিদিন: ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন। তার বিশ্বস্ততা চিরন্তন। বড়দিন শুধু অতীতের স্মৃতি নয় এটা নৈমিত্তিক বিষয়। বড়দিন হচ্ছে ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতি আমাদের চক্ষু খোলার সময় মানুষের মর্যাদা আবিষ্কারের সময়। ঈশ্বর আমাদের একজন হলেন। সবার অন্তরের তিনি জন্ম নিলেন। যাতে আমরা তার মত হতে পারি। বড়দিন হলো সবচেয়ে ব্যস্তময় সময়। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এ আনন্দ পালনে মাতোয়ারা। আদম হবার পাপের ফলে এ পৃথিবী পাপে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলো। মানুষ অন্ধকারে ছিলো। এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের আশায় মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে মুক্তিদাতার। ঈশ্বর বিভিন্ন সময়ে প্রবক্তাদের মুখ দিয়ে মুক্তিদাতার জন্মের আগমন বার্তা ঘোষণা করেছেন। *(ইসা: ৭:১৪, ২য় সামুয়েল ৭:১৪)* এছাড়া প্রবক্তা যোয়েল, মিখা এবং মালাখীও এ সমন্ধে বলেছেন।

পরে কালের পূর্ণতায় এক কুমারী পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভধারণ করলেন এবং সন্তান জন্ম দিলেন। তিনি রাজা কিন্তু জন্ম নিলেন দীনবেশে। মারীয়া প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছেন, যোসেফ হন্যে হয়ে একটু আশ্রয় খুঁজছেন কিন্তু কোথাও একটু আশ্রয় পেলেন না। অবশেষে তাদের একটু জায়গা মেলল গোশালায় যেখানে the miracle took place। কনকনে শীত, চারিদিকে শান্ত, সৌম্য, শৈত্য প্রবাহে শিশু যিশু কাতরাচ্ছেন। গোশালার চারপাশে প্রাণীগুলো চারদিক ঘিরে রেখে একটু উষ্ণতা জুড়ে দিল। মারীয়া তৎক্ষনাৎ শিশুটির সেবা যত্ন শুরু করে দিল, শিশুটিকে টুকরো কাপড় দিয়ে যা তিনি অতীব যত্নসহকারে তৈরী করেছেন তা দিয়ে জড়িয়ে। গোশালাটা আলোময় হয়ে উঠলো। স্বর্গীয় দূতবাহিনীর দীপ্তিময় দ্যুতিতে। কিন্তু বেশিরভাগ প্রস্তুতিই আমাদের বাহ্যিক, বেশিরভাগ আয়োজনই আমাদের লোক দেখানো। এক আশ্রয়হীন, বস্ত্রহীন, দীনরাজকে বরণ করার জন্য বাইরে আমরা সং সেজে উলঙ্গ হৃদয় নিয়ে তাকে বরণের উৎসব করি। এ যে কত বড় আত্মপ্রবঞ্চনা, কতবড় ফাঁকি, এক উলঙ্গ শিশুর মুচকি হাসি আমাদের অন্তরের সেই উলঙ্গতাকে আরাও প্রকটভাবে দেখিয়ে দেয়, আমাদের লজ্জা দেয়।

জীর্ণশীর্ণ গোশালা এক রহস্য বৈকি-পবিত্র বাইবেল পাঠ থেকে সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে, যে মূল্যবোধ নিয়ে তথা নম্রতা, ভালোবাসা, ক্ষমা ও নম্রপূর্ণতা ভালোবাসা নিয়ে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের আগমন এমন আশ্রয়হীনভাবে জন্ম নিয়েই ঈশ্বর যা প্রকাশ করলেন, অন্ন-বস্ত্রহীন তথা দীনহীন মানুষের সাথে মিলিত হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। বড়দিনে এই গোশালার সামনে ভক্ত স্থীর ও ধ্যানী দৃষ্টি রেখে থমকে দাঁড়ায়। অবাক হয়ে যায়, নম্রতা, ক্ষমা, ভালোবাসা প্রকাশের এমন অভিনব বাস্তবতা দেখে। আর এক পর্যায়ে আনত হয়ে প্রণাম করে সেই দেহধারিত ঈশ্বরের, নবজাত শিশু যিশুর প্রতিকৃতিতে চুম্বনে সিক্ত করে, আর এভাবেই ভক্ত তার ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে নিজে নম্র হয়ে। সেই মহামানবকে একান্তভাবেই ভালবাসে, ভালবাসে ভাই মানুষকে।

আমরা যেন খ্রিস্টের মত হয়ে উঠি কেননা, খ্রিস্ট আমাদের মত হয়েছেন। আমরা যেন তারই জন্য দেবতা হই কারণ তিনি আমাদের জন্য মানুষ হয়েছেন। তিনি নিম্নতর কিছু ধারণ করেছেন, যেন আমরা উর্ধ্বতর কিছু ধারণ করি। তিনি গরীব বেশধারী হলেন, আমরা যেন তার দারিদ্রে ধনী হতে পারি। তিনি কৃতদাসের রুপ ধারণ করেছেন যেন আমরা স্বাধীন হয়ে উঠি। তিনি অবতরণ করেছেন যেন আমরা স্বর্গে আরোহন করতে পারি। তাকে প্রলুব্ধ করা হয়েছে যাতে আমরা জয়ী হই। তিনি অপমানিত হয়েছেন আমরা যেন গৌরবে পরিপূর্ণ হই। প্রত্যেকে তার সবই দান করুক যিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছেন - যে কেউ তার সবই তাকে দান করুক। সে যতই দিক না নিজেকে বিলিয়ে না দিলে কোনদিন যে যথেষ্ট দিতে পারবে না।

ব্যক্তিগত জীবনে নবীকরণের মাধ্যমে শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও যিশু বিশ্বাসে অটল থেকে আমরা যেন হয়ে উঠি যিশুময়- খ্রিস্টময়। তখন আনন্দ কেবলমাত্র বড়কেন্দ্রিক হবে না, বড়দিনও শুধুমাত্র একদিন হবে না। কিন্তু তা হয়ে উঠবে ভক্তের প্রতিদিনের উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা ও জীবন যাপন। তাই যিশু ধ্যানে জ্ঞানে ও আচার আচরণে আমাদের জীবনে প্রতিদিনই হোক বড়দিন। জীবনের গভীরের প্রবেশার্থ যিনি বড়দিনের মণি সেই যিশুর মতই হোক আমাদেও সবার জীবন যাপন। তিনিতো স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও, ঈশ্বরের সঙ্গে তার সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না বরং নিজেকে রিক্ত করলেন, দাসের স্বরূপ গ্রহণ করে তিনি মানুষের মত হয়েই জন্ম নিলেন। যিশুর জন্ম নম্র, বিনয়ী ও মহৎ হওয়ার দিন। বড়দিন মানুষ হওয়ার দিন॥

দরিদ্রদের মাঝে যিশুর জন্ম

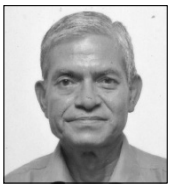

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

ভূমিকা:

পবিত্র আত্মার প্রভাবে, মারীয়ার গর্ভে যিশু মানব দেহ ধারণ করে জগতে প্রেরিত হলেন। ঈশ্বরের সুমহান পরিকল্পনাই ছিল তাঁর একমাত্র পুত্র দীন-দরিদ্রদের মাঝে মঙ্গলবাণী প্রচারে জগতে প্রেরিত হবেন। পবিত্র আত্মার আত্মিক প্রেরণায় যিশু দীন-দরিদ্র এবং নম্র-বিনয়ীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্যে ঈশ্বর তাঁকে অভিষিক্ত করেছেন। যিশাইয়া ভাববাদী এবং মঙ্গল সমাচার লেখক লুকের কাছে প্রভুর বাণী যেভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল তা থেকে এটাই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নম্রগণের কাছে সমাচার প্রচার করতে সদাপ্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, যেন আমি ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের ক্ষত বেঁধে দেই, যেন বন্দি লোকদের কাছে মুক্তি ও কারারুদ্ধ লোকদের কাছে কারামোচন প্রচার করি *(যিশাইয়া ৬১:১, লুক ৪:১৮-১৯)*। ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে রাজ-সিংহাসনে, রাজবস্ত্র পরিধান করে তিনি জন্ম নিতে পারতেন। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও পরিকল্পনায় যিশুর জন্ম হয় গবাদি পশুর আস্থা, দীন দরিদ্রবেশে। জন্মস্থান এবং জন্ম বিবরণ আমাদের এটাই প্রমাণ দিচ্ছে যে, তিনি মানব যিশুর পূর্ণ আচরণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাস্তবতার স্বীকার হয়ে স্বভাবে মানুষ হয়েছিলেন। যিশু ঈশ্বর হয়েই পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্য আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না, বরং নিজেকে রিক্ত করে তিনি মানুষের মতোই বসবাস করেছেন। আকারে প্রকারে মানুষ হয়েই নিজের নম্রতা প্রকাশ করেছেন। পুত্রকে দিয়ে ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে দরিদ্রদের মাঝে মানব দেহ ধারণ করে জন্মের মাধ্যমে। আসন্ন বড়দিন, প্রভু যিশুর জন্মদিন আমাদের জন্য বয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ, মুখ ও শান্তির বার্তা এ প্রত্যাশা আমাদের খ্রিস্ট বিশ্ববাসী সকলের।

যিশুর আগমন

সাধারণ দরিদ্র বেসে যিশুর জন্ম। যিশুর জন্ম সাধারণ হলেও বলিষ্ঠ কণ্ঠে অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে অসহায়, দীন-দরিদ্রদের মাঝে সুখবর প্রচার করতে আগমন করেছেন। ভাববাদীদের মুখে শুনতে পাই যিশুর জীবনের উদ্দেশ্য ও তাঁর মুক্তির পরিকল্পনা। যিশু আসেন-

(ক) গরীবদের কাছে সুখবর প্রচার করতে।

(খ) বন্দীদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে।

(গ) অন্ধদের দৃষ্টিদান করতে।

(ঘ) অত্যাচারিতদের মুক্ত করতে।

(ঙ) সমস্ত মানবজাতির উপর ঈশ্বরের দয়ার দিন ঘোষণা করতে *(লুক ৪:১৮-১৯)*।

যিশু স্পষ্টই বলেছেন, তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত সেই অভিষিক্তজন যার হাতে রয়েছে মুক্তিযুগের বার্তা ঘোষণা করার দায়িত্ব। তাই ভাববাদীগণের বক্তব্যে যিশুখ্রিস্টের আগমন, জন্ম এবং যিশুর প্রকাশ্য কার্যকালকে "মুক্তিদানের যুগ" হিসেবে পরিগণিত হয়। মুক্তির ইতিহাসেই যিশুর প্রকাশ্য জীবন ও কার্যকালের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রভু ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে জগতে পাঠিয়ে বিশ্বমানবকে জানতে দিলেন আলোর ও মুক্তির পথ। আর মানব জাতি যাতে জানতে পারে মনুষ্য পুত্রের মাধ্যমেই জগতে পরিত্রাণ এসেছে। তাঁর হাত ছাড়া আর কোন হাতে ত্রাণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কারণ আকাশের নীচে মানুষের সামনে এমন আর কোন নাম নির্দিষ্ট করে রাখা হয়নি, যে নামের শক্তিতে আমরা পরিত্রাণ লাভ করতে পারি *(শিষ্যচরিত ৪:১২)*।

দরিদ্রদের পক্ষ নেয়া

দীন দরিদ্রদের পক্ষ নেয়া, তাদের সেবা করা এবং তাদের মাঝে খ্রিস্টের মঙ্গলবাণী প্রচার করা ও তাদের মাঝে তাদেরই আপন হয়ে বসবাস করা মণ্ডলীর লক্ষ্য। কারণ খ্রিস্ট নিজে তাই করেছেন। আর এই চেতনাকে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভায় গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করে নানা প্রকার নির্দেশ দিয়েছেন। "মনুষ্যপুত্র এ পৃথিবীতে সেবা করতে এসেছেন, সেবা পেতে নয়।" অবশ্যই খ্রিস্টীয় সেবা সর্বজনীন- সব মানুষের জন্যে হলেও প্রাধান্য পেয়েছে প্রধানতঃ সমাজের দীন-দুঃখী ও নির্যাতিত জনগণের জন্যে। খ্রিস্ট গরীবদের পক্ষ নিয়ে সমাজে উচ্চশীল ধনীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করে আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রমাণ রেখে গেছেন। তাই প্রকৃত খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের ক্ষেত্রে সেই একই কথা প্রযোজ্য দীন-হীন ও বঞ্চিত জনগণের প্রতিবাদ জানানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। প্রবক্তা তৎকালীন সমাজে দীন-দুঃখী বঞ্চিত জনগণের পক্ষ নিয়ে ধনবান ও ক্ষমতাশালীদের কঠোর ভাষায় বলেছেন, ধিক, তোমরা অভিশপ্তের দল। তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। কারণ তোমরা, তোমরা গরীব-দুঃখীদের শ্রমের মূল্যে এবং তাদের ঠকিয়ে নিজেরা দিনের পর দিন ধনী হয়ে উঠেছ *(আমোষ ৮:৪-৯)*। সাধু মথি যথার্থ ও বাস্তব সত্য কথা উল্লেখ করেছেন- মানব সমাজের অবহেলিত, ঘৃণিত, দীন-দরিদ্ররাই হবে আমাদের অন্তিম বিচারের মানদণ্ড। খ্রিস্ট তাদের পরিচয়েই আমাদের নিকট উপস্থিত হন... *(মথি ২৫: ৩১-৪০)*। আমাদের জন্য অনুধ্যান হতে পারে- শোন হে খ্রিস্টান, আমি ছিলাম ক্ষুধার্ত, আর তুমি গড়ে তুলেছ সংঘ সমিতি আলোচনা করতে আমার ক্ষুধা সম্বন্ধে। তোমায় ধন্যবাদ অন্যায়ের প্রতিবাদে আমাকে যেতে হলো কারাগারে, আর তুমি চলে এলে চ্যাপেলে অতি সন্তর্পনে, প্রার্থনা করলে আমার সত্ত্বর মুক্তির জন্যে। তোমায় ধন্যবাদ। আমি বিছানায় ছিলাম বস্ত্রশূন্য, আর আমাকে দেখে তোমার মনে উঠেছে আমার দেহের নৈতিকতা নিয়ে তর্কের ঝড়। আমি ছিলাম রোগে শয্যায় শায়িত, আর তুমি তোমার ভালস্বাস্থ্যের জন্য হাঁটু গেড়ে প্রভুকে দিয়েছ ধন্যবাদ। আমি ছিলাম গৃহহীন, আর আমাকে শুনিয়েছ ভগবানের ভালবাসায় আত্মিক আশ্রয়ের কথা। আমি ছিলাম নিঃসঙ্গ, আর তুমি আমাকে একা ফেলে চলে গেলে আমার জন্যে প্রার্থনা করতে। তোমাকে ঈশ্বরের খুব কাছে বলেই মনে হয়, কিন্তু আমি যে এখন খুব ক্ষুধার্ত, এখনও নিঃসঙ্গ, এখনও নিষ্প্রাণ। যিশুর কল্যাণবাণী: যেমন যিশুর জন্ম হয়েছে দরিদ্রদের মাঝে তদ্রুপ দীন-দরিদ্রদের জন্য সান্ত্বনা, আশীর্বাদ, অনুগ্রহ দানে ধন্য, করে তুলেছেন। তাদের কল্যাণার্থে এ কথাই বলেছেন, "গরীবেরা তোমরা ধন্য কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই। ধন্য তোমরা, যাদের এখন খিদে আছে, কারণ তোমরা তৃপ্ত হবে। যারা এখন কাঁদছ, তোমরা ধন্য, কারণ তোমরা হাসবে। ধন্য তোমরা,

যখন মনুষ্যপুত্রের দরুণ লোকে তোমাদের ঘৃণা করে, সমাজ থেকে বের করে দেয় ও নিন্দা করে এবং তোমাদের নাম শুনলে থু থু ফেলে। সেই সময় তোমরা খুশী হয়ো ও আনন্দে নেচে ওঠো, কারণ স্বর্গে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে *(লুক ৬:২০-২২)*। প্রকৃত পক্ষে যিশুর রাজ্যের অধিকারী হলো গরীবেরা *(লুক ৬:২০)*; ক্ষুধার্তরা *(লুক ৬: ২১)* দুঃখার্তরা *(লুক ৬:২৩)* এবং যারা যিশুর নামে ঘৃণিত ও অত্যাচারিত *(লুক ৬:২২-২৩)*।

দরিদ্রদের প্রতি বেশি ভালবাসা:

পোপ দ্বিতীয় জনপলের প্রেরণ কর্ম ও সেবাকাজ সম্পর্কে সীনডোত্তর প্রৈরিতিক প্রেরণ পত্রে (৩৪) মানব উন্নায়নের কাজ করতে গিয়ে মণ্ডলী দরিদ্র ও যাদের প্রতিবাদ করার বা কথা বলার সুযোগ, ক্ষমতা নেই তাদের প্রতি বেশি ভালবাসা দেখিয়ে থাকে, কারণ প্রভু নিজেই তাদের সাথে বিশেষভাবে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন *(মথি ২৫:৪০)*। এই ভালবাসা কাউকেই বাদ দেয় না; কিন্তু শুধু সেই সব সেবা কাজকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে যেগুলোর বিষয় সমগ্র খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যই সাক্ষ্য বহন করে। "দরিদ্রদের প্রতি এই অগ্রাধিকার সম্পন্ন ভালবাসা, এবং এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করি, সেগুলো অগণিত মানুষ যারা ক্ষুধার্ত, অভাবী, গৃহহীন, যারা চিকিৎসা সেবা পায় না ও সর্বোপরি, যাদের শ্রেয়তর ভবিষ্যতের আশা নেই, তাদের গ্রহণ না করেই পারে না। এই সকল বাস্তবতাগুলোকে আমলে না নিয়ে চলা একান্তই অসম্ভব। এগুলোকে অস্বীকার করার অর্থ হলো 'ধনী লোকের মত যে তার ঘরের দোরগোড়ায় শুয়ে থাকা ভিখারী লাজারকে দেখেও না দেখার ভান করেছিল *(লুক ১৬:১৯-৩১)*।' দরিদ্রদের সাথে সংহতি তখনই বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে যখন খ্রিস্টানরা নিজেরা যিশু খ্রিস্টের আদর্শ অনুকরণ করে সরলভাবে জীবন-যাপন করে। জীবনের সরলতা, গভীর বিশ্বাস ও সকলের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, বিশেষভাবে দরিদ্র ও নীচু শ্রেণীর মানুষদের প্রতি ভালবাসা হলো ক্রিয়াশীল মঙ্গলসমাচারের (Gospel in action) উজ্জ্বল চিহ্ন। সীনড পিতৃগণ এশিয়ার কাথলিক ভক্তদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা মঙ্গলসমাচারের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন বেছে নেয়, যেন তারা খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রেরণকার্যে আরো বেশি অবদান রাখতে পারে এবং যেন খ্রিস্টমণ্ডলী নিজেই হয়ে উঠতে পারে দরিদ্রদের মণ্ডলী ও দরিদ্রদের জন্যে মণ্ডলী।

ঈশ্বরের জনগণের মাঝে দরিদ্রদের বিশেষ স্থান:

মহামান্য পোপ ফ্রান্সিসের ধর্মোপদেশ মঙ্গলবার্তার আনন্দ গ্রন্থের ১৯৭ ধারার বক্তব্যই হচ্ছে এটি। ঈশ্বরের হৃদয়মন্দিরে গরিবদের জন্য বিশেষ স্থান আছে, আর সেই স্থান এতটাই বিশাল ও বিস্তৃত যে, তাদের জন্য তিনি "নিজেকে করেছিলেন দরিদ্র" *(২ করি ৮:৯)*। আমাদের মুক্তির গোটা ইতিহাস জুড়েই দরিদ্রদের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রান্তে অবস্থিত ছোট একটি পল্লীনিবাসী দীনহীন এক কুমারী কন্যার মুখ দিয়ে প্রদত্ত "সম্মতির" মাধ্যমে আমাদের পরিত্রাণ এসেছে। ত্রাণকর্তা জন্মেছিলেন দীনবেশে দরিদ্র পরিবারে শিশুদের ন্যায় গোশালায়, গৃহপালিত পশুদের মাঝখানে। তাঁর নামে মন্দিরে উৎসর্গ করা হয়েছিল একজোড়া ঘুঘু পাখি, প্রথা অনুযায়ী একটি মেষ জোগাড় করার মতো সামর্থ্য যাদের ছিলনা তাদের মতো *(তুলনীয় লুক ২:২৪; লেবীয় ৫:৭)*; সাধারণ শ্রমিকের পরিবারেই তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং নিজের আহার জোগাড় করতেন নিজ হাতে পরিশ্রম করে। প্রমাণ করে তাঁকে অনুকরণ করেছিল দরিদ্র ও নেতা: "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার ওপর নিত্য অধিষ্ঠিত, কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন দীনদরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে *(লুক ৪:১৮)*।" যারা শোকার্ত ও দারিদ্রদের কষাঘাতে জর্জরিত তাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন যে, ঈশ্বরের মনে তাদের জন্যে বিশেষ স্থান আছে: "তোমরা, দীনদরিদ্র মানুষ যারা, ধন্য তোমরা! ঐশরাজ্য তোমদেরই *(লুক ৬:২০)"* এমনকি তিনি নিজেই তাদের একজন হয়েছেন: আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; এবং তিনি তাদের শিখিয়েছেন যে, এসব লোকদের প্রতি দয়া প্রদর্শনই স্বর্গরাজ্যে স্থান পাবার উপায়।

দীনদরিদ্র জনগণ একটি বিশেষ ঐশতাত্ত্বিক শ্রেণী:

সেই হিসেবেই তাদের অগ্রাধিকার স্বীকৃত, তা কোনভাবেই কোন সাংস্কৃতিক, সমাজ বিদ্যাগত, রাজনৈতিক অথবা দর্শনভিত্তিক শ্রেণী নয়। ঈশ্বর দরিদ্রদের নিকট তাঁর "প্রথম দয়া" প্রকাশ করেন। ঐশরিক বিধানে এই অগ্রাধিকার সকল খ্রিস্টভক্তের বিশ্বাস জীবনের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ, যেহেতু "খ্রিস্টযিশুর নিজের যে মনোভাব ছিল... সেই মনোভাব *(ফিলিপ্পীয় ২:৫)* আমাদেরও থাকা উচিত।" এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মণ্ডলী দরিদ্রদের পক্ষাবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার অর্থ হচ্ছে "খ্রিস্টীয় ভ্রাতৃপ্রেমের জীবন-যাপনে বিশেষ ধরনের প্রাধান্য বজায় রাখা, যার প্রমাণ হচ্ছে গোটা মণ্ডলীর সকল ঐতিহ্য।" এই সিদ্ধান্ত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট যেমন শিক্ষা দিয়েছেন-ঈশ্বরে সেই খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত যিনি আমাদের জন্যে গরীব হয়েছেন, যাতে আমরা তাঁর দারিদ্রের গুণে ধনবান হতে পারি।" সেই জন্যেই আমি এমন মণ্ডলী চাই, যে মণ্ডলী নিজে দরিদ্র এবং দরিদ্রের কল্যাণে নিবেদিত। কেননা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেবার মতো আমাদের অনেক কিছুই আছে। তারা যে শুধু বিশ্বাসবোধে সহভাগিতা করে তা নয়, উপরন্তু তাদের দুঃখ-কষ্টের কারণেই তারা কষ্টভোগী খ্রিস্টের পরিচয় জানতে পারে।

উপসংহার:

স্বল্প পরিসরে যিশুর জন্ম বৃত্তান্ত তুলে ধরা সম্ভব না হলেও দরিদ্রদের মাঝে যিশুর জন্ম এ সত্যটি সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরার প্রয়াসের কোন কমতি ছিলনা। মানবজাতির আর্থিক ও আত্মিক দারিদ্রাবস্থা বাস্তবতার নিরিখেই করা হয়েছে। এ অবস্থার একটি চিত্র বা ঘটনা বলছি- একদিন রাতে একটা চোর চুপে চুপে এক সন্ন্যাসীর ঘরে ঢুকলো। চোরটি যখন তন্ন তন্ন করে কিছু খুঁজছিল তখন সে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "বন্ধু, কেন তুমি কষ্ট করে অন্ধকারে খুঁজছো যা দিনের আলোতে খুঁজে বের করতে পারবেনা?।" পরিশেষে গরীবদের জন্য ধনী লোকের একটি প্রার্থনা উল্লেখ করতে চাচ্ছি...আন্তিয়োখিয়া নগরে একজন বিরাট ধনী লোক বাস করতেন। প্রত্যেকদিন তিনি গরীবদের জন্যে এই বলে প্রার্থনা করতেন, "প্রভু, তুমি দরিদ্রদের দুরবস্থা থেকে তাদের মুক্তি দাও।" এ ধরনের প্রার্থনার কথা জানতে পেরে আব্বা মাকারিউস তাকে এই ভাবে চিঠি লিখলেন,"আমার ইচ্ছে তোমার যত টাকা-পয়সা আছে তা আমাকে দিয়ে দাও।" বিস্মিত হয়ে ধনী লোকটা তাঁর কাছে একজন দূত পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলের,"আপনি আমার টাকা-পযসা নিয়ে কি করবেন?" আব্বা মাকারিউস এই উত্তর দিলেন, "তোমার কর্তাকে গিয়ে বলো, আমি তার টাকা নিয়েই তার প্রার্থনা পূর্ণ করবো।" প্রভু যিশুর জন্মবারতা সকল ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করুক এবং অনাবিল সুখ ও শান্তি সকলের অন্তরে নিত্য বিরাজ করুক॥

হৃদয় গোলাশায় যিশুর দেহধারণ

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

"আনন্দিত হও হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গেই আছেন *(লুক ১:২৮)*।" ধন্যা কুমারী মারীয়ার নিকট উচ্চারিত এই বাক্যের মধ্যদিয়ে আমরা সকলের হৃদয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করি। "শোন, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রের জন্ম দিবে। তার নাম রাখবে যিশু। তিনি মহান হয়ে উঠবেন, পরাৎপরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন। *(লুক ১:৩১-৩২)* ঈশ্বরের আহ্বানের কথা শুনে প্রথমে বিচলিত হলেও সকল দ্বিধা পরিহার করে কুমারী মারীয়া ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে জীবনের শ্রেষ্ঠতম উপহার ভেবে মেনে নিয়েছিলেন, তাঁর সকল অনুগ্রহকে অন্তরে ধারণ করে অনুভব করেছিলেন ঐশরিক দানের এক মহাশক্তিকে। আমরা প্রতিজনই ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি, আমাদের প্রত্যেককে তিনি কোনো না কোনো কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন, যেমনটি নিয়েছিলেন নাজারেথ শহরের যোয়াকিম ও আন্নার মেয়ে কুমারী মারীয়াকে। তাঁর গর্ভে যিশুর উপস্থিতি মানুষের মুক্তির পূর্ববার্তা নিয়ে আসে আর মুক্তিদাতার জন্মের মধ্যদিয়ে সেই মুক্তির দ্বার চিরকালের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। যারা শিশুর জন্মের সেই প্রজ্বালিত আলোকে চিনতে পারে, যারা তাঁর বাণীর অর্থ বুঝতে পারে ও হৃদয়ে তার শিক্ষা ধারণ করে তারাই সেই শক্তিময় আলোর পথে দিনে দিনে স্বর্গের দিকে চালিত হতে পারে।

জগতের বিচিত্র সকল সৃষ্টির মধ্যে আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি, মহিমা ও তাঁর মাহাত্ম্য দেখতে পাই। তাঁর করুণা ধারায় নিয়তই বয়ে চলে প্রতিটি জীব, প্রতিটি ঘটনা; সৃষ্টি হয় নতুন নতুন প্রাণের। এই সকল প্রাণের গভীরে বিরাজ করেন স্বয়ং ঈশ্বর। জগত সৃষ্টির পর শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন সমস্ত কিছুর উপর প্রভুত্ব করার অধিকার ও ক্ষমতা। কিন্তু মানুষ সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষে তাদের জীবন ভরিয়ে তোলে। পাপের কঠিন তমসায় ডুবে যাওয়া মানুষকে মুক্ত করতেই ঈশ্বর তাঁর সন্তানকে নিজের সাদৃশ্যে ও আদর্শে মানবত্রাতারূপে জগতে পাঠালেন।

মানুষের জ্ঞান-বিবেচনার চেয়েও অধিক শক্তিশালী ও স্বার্থক হলো ঈশ্বরের পরিকল্পনা। মানুষকে আলোর পথ দেখাতে, তাঁর বাণী মানুষের অন্তরে গেঁথে তুলতে তার পরিকল্পনায় ও ইচ্ছাতেই কেবল তিনি মানুষরূপে অনন্য মানুষকে ঐশ ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে জগতে পাঠালেন। ঈশ্বরপুত্র হয়েও সেই শিশুর জন্ম হলো জীর্ণ-শীর্ণ এক গোয়াল ঘরে, অতি সাধারণ ও পরম নির্মল এক কুমারী মারীয়ার গর্ভে। যেই ঈশ্বরের রয়েছে অপার শক্তি, জগতের সকল অসাধ্যকে সাধন করার পরাক্রিম সেই ঈশ্বর কেবল আমাদের নম্রতা ও দীনতার শিক্ষা দিতে যিশুকে অতি জীর্ণবেশে জগতে পাঠালেন। অতি দরিদ্রবেশে তার এই জন্মের মধ্যদিয়েই তিনি আমাদের অহংকার ও জাগতিক মোহ থেকে মুক্ত হয়ে নম্রতার জীবন গড়তে শিখিয়েছেন, আশ্রয় নিয়েছেন আমাদের অন্তরের আবাসস্থলে। আজও তার জন্মের তিথিতে আমাদের বাহ্যিক পরিকল্পনার চেয়ে হৃদয়কে তাঁরই সাদৃশ্যে তাঁরই উপযোগী করে সাজিয়ে তুলি। তাঁর জন্মদিনে সাজসাজ রব, সরস সংগীত ও সকল আয়োজন আমাদের আত্মিক পরিতৃপ্তিরই বহিঃপ্রকাশ। নিজের গর্ভজাত ও ঔরষজাত সন্তানের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দের দিন হিসাবে আমরা আমোদিত হই যিশুর জন্ম তিথিতে, পরম প্রাপ্তিতে ভরে তুলি আমাদের অন্তর। প্রতি বছর নতুন আঙ্গিকে হৃদয়কে সাজাই তার আগমনের কথা স্মরণ করে।

জগত সংসারে আমাদের যত রাজত্ব, সকল কিছুই ম্লান ও অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি আমরা তা অপরের কল্যাণে ব্যবহার না করি। প্রভু যিশুর জন্মের মধ্যদিয়ে আমরা শিখেছি দারিদ্রতার মধ্যদিয়ে জীবনকে উপভোগ করা যায়, অপরের কল্যাণের মধ্যদিয়ে শান্তি পাওয়া যায় এমনকি অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করে স্বর্গরাজ্যে স্থান লাভ করা যায়। যিশুর জীবন আদর্শ থেকে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি যে, অতি দরিদ্রবেশেও আমরা ঈশ্বরের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারি, নম্রতার মধ্যদিয়ে তার ভালোবাসা পেতে পারি। আর প্রকৃত অর্থেই এসব করা যায় যখন আমরা ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে, যিশুকে অন্তরে ধারণ করে জীবন-যাপন করবো। আমাদের হৃদয় আত্মিক সৌন্দর্য্যে মহিমান্বিত ও প্রেমে পরিপূর্ণ এক গোশালায় পরিণত হবে কেবল তখনই যখন আমরা পাপ ও জগতের মোহ ত্যাগ করবো, হৃদয়ে যিশুর উপস্থিতি অনুভব করতে পারব।

বড় দুর্ভাগা জাতি সেই বেথলেহেম নগরীর মানুষেরা, যারা যিশুর আগমনের প্রতিক্ষায় জাগতে পারেনি, প্রচণ্ড শীতে যারা এক গর্ভবতী মায়ের প্রসব বেদনার আকুতি শুনতে পায়নি। বিশ্ব সংসারে তার জন্মের শুরুটাই ছিল চরম কষ্টের ও বেদনার, একই সাথে মা মারীয়া ও সাধু যোসেফের জন্যও ছিল আরও বেশি মর্ম বেদনার। মানুষের দ্বারে দ্বারে আশ্রয় চেয়েও তা না পাওয়ায় তারা গৃহপালিত পশুর সাথে তাদেরই জীর্ণকুটিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজ আমরা মহাআড়ম্বরে যিশুর জন্ম দিন উদ্‌যাপন করি, আমাদের চারপাশ আলোয় আলোকিত করে তুলি। বড়দিন কেবল বাহ্যিক আয়োজনে সিদ্ধ করা নয়, বড়দিনের আসল তাৎপর্যেই হলো হৃদয় গোশালাকে পরিপূর্ণ সাজে সজ্জিত করা, তাকে বরণ করার জন্য বিনম্র হওয়া, তার শিক্ষাকে জীবনে উপলব্ধি করে আমাদের জীবনে সেইরূপ আচরণ করা। ঈশ্বর চান যেন আমরা আমাদের হৃদয়কে বাইরের চেয়ে অধিক আলোয় আলোকিত করি যেন যিশু সেই সাজানো গোছানো অন্তরে আশ্রয় নিতে পারেন। ঈশ্বরের অংশরূপেই আমরা যিশুকে পাই তাই ঈশ্বরের সাথে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক ও বন্ধন আরও গভীর করার জন্য ঈশ্বর চান যেন তাঁর সেই পবিত্র অংশকে অন্তরে ধারণ করি। যিশুকে গ্রহণ করার মধ্যদিয়েই কেবল আমরা আত্মায় প্রশান্তি লাভ করি ও জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলি। ঐশরিক শক্তিবলে যেই খ্রিস্টকে আমরা পেয়েছি, আমরা আজ সেই জন্মদিনের কথা স্মরণ করে পুলকিত হই, ঘরবাড়ি ও চারপাশ সাজিয়ে তুলি।

আমরা অনুতপ্ত এই ভেবে যে, আমাদের পূর্ব পুরুষের ঘরে যিশু জন্মের জন্য এতটুকুও আশ্রয় মিলেনি, আমরা অনুতপ্ত হই এই ভেবে যে, আমাদের অন্তর এখনও প্রস্তুত করিনি যিশুকে গ্রহণ করার জন্য, জাগতিক বিষয়ে সর্বদা আসক্ত হয়ে ভুলে থাকি আমাদের প্রতি অর্পিত ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তারজন্যও আমরা অনুতপ্ত হই। এই অনুতাপ ও বিনম্রতার মধ্যদিয়ে আমরা যিশুর জন্মের উপস্থিতি আমাদের জীবনের উপলব্ধি করতে পারবো। আর ঈশ্বরও চান যেনো আমরা সর্বদা প্রস্তুত থাকি, তার প্রিয় পুত্র যিশুকে অন্তরে ধারণ করে মুক্তির পথ চিনে জীবনের নতুনভাবে উজ্জীবিত করতে পারি। দেহ-মন-আত্মায় পরিশুদ্ধ থাকার অর্থই হলো যিশুর সাথে বসবাস করা আর এই অবস্থার মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরের সাথে বাস করার সুযোগ লাভ করি।

যিশু তার জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে আমাদের চিরকালের জন্য ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে সহায়তা করেছেন, ধন্য আমরা, যারা তাকে লাভ করেছি, হৃদয়ে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করেছি। তিনি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের মধ্যদিয়ে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেও আমরা যারা বিশ্বাসী চোখ বন্ধ করে অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখতে পাই, তাঁর উপস্থিতি অনুভব করি। তাঁর কর্ম ও জীবন থেকে আমরা যেই শিক্ষা অর্জন করেছি তা প্রতিপালন করে ঈশ্বরের সন্তান রূপে আমাদের যে আত্মপ্রকাশ তা তাঁর জন্মেরই অবদান। যিশুর জন্মের মহিমা হৃদয়ে ধারণ করে আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি নিঃশ্বাসে গর্ববোধ করি এই ভেবে যে, ঈশ্বর তার প্রিয় পুত্রকে কেবল আমাদের ভালোবেসেই এই জগত-সংসারে পাঠিয়েছেন, প্রকাশ করেছেন অপার প্রেমের মহিমা; সেই মহিমায় প্রজ্বালিত হই আমরা সকলে। ঈশ্বরপুত্র হয়ে, পরম শক্তির আধার হয়েও যিশু মেষশাবকদের পাশে জীর্ণ গোশালায় জন্ম নিয়েছেন, যা স্মরণ করে আমরা ব্যথিত হই, নিজেদের পাপের জন্য প্রবল অনুশোচনায় অনুতপ্ত হই; আর এই অনুতাপের মধ্যদিয়েই আমাদের হৃদয় পরিণত হবে পরিশীলিত এক গোশালায়; যেখানে প্রতিনিয়তিই যিশুর জন্মের মহিমা প্রকাশিত হবে। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর জন্মের কৃপা ও মাহাত্ম্যে যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সকল মানুষ আশীর্বাদিত হবে, তাঁর শিক্ষা অনুসরণ ও প্রতিপালনের মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠবো॥

বড়দিন: একটি উপহারের নাম!

ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ

ছবি: লিটন আরিন্দা

বড়দিন আনন্দ, উৎসব, উদ্দীপনা, রোমাঞ্চকর, আবেগপূর্ণ, রহস্যে ঘেরা, বিশ্বাস ও উচ্ছ্বাসে এবং অনেক অনেক মজায় পরিপূর্ণ একটা দিন। এটা একটা আলাদা রকম বিশেষ দিন। এই দিন এমন একটা দিন, যে দিন আমরা আমাদের কি আছে, আর কি নেই তা নিয়ে চিন্তা করে আনন্দ করি না। কিন্তু আমরা আনন্দ করি। আমরা আমাদের কোন অভাবের কথা কিংবা না পাওয়ার আক্ষেপ এই দিন স্মরণে আনি না। বাহ্যিকভাবে আমাদের যা-ই থাকুক বা না-ই থাকুক না কেন; তা আমরা আমাদের কর্তব্যের মধ্যেই আনি না। কিন্তু আমরা শুধুই আনন্দ করি। আমরা আনন্দ করি এই ভেবে যে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে এক মহা-উপহার লাভ করেছি; আর সত্যি বলতে কি, যার যোগ্য অবশ্যই আমরা নই। আমরা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের সেই পরম উপহার প্রদানের দিন অর্থাৎ যিশুর জন্মদিন উদ্‌যাপন করি। যিশুই আমাদের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত সেই মহোত্তম উপহার, বড়দিনের শিরোমনি।

আমাদের মধ্যকার উপহার আদান-প্রদান খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। সকল দেশে, সকল সমাজেই, এমনকি ধর্মীয় রীত-নীতির মধ্যেও উপহার আদান-প্রদানের এই প্রচলন প্রচলিত আছে। ছোট বড় সকলের মধ্যেই উপহার দেওয়ার ও পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বিরাজমান। আমরা সবাই কোন না কোনভাবে উপহারে অভ্যস্ত। তাই, উপহার কি বা কাকে বলে? কিংবা উপহার এর সংজ্ঞা কি? এই প্রশ্ন করা অবান্তর। কারণ, আমরা কখনোই তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করি না; এবং এ নিয়ে ভাববার চিন্তাও করি না। উপহার বললে 'উপহারই' বুঝি, উপহার বলতে যা বুঝায় আমরা তার সবটাই মুহূর্তের মধ্যে আমাদের বোধগম্য হয়, আমরা বুঝে যাই। এক কথায় আমরা তাকেই উপহার বলি যা স্বেচ্ছায়, স্বপ্রনোদিত হয়ে কেউ কাউকে প্রদান করে; কোনরূপ মূল্য বিনা এবং প্রতিদানের আশা না করেই যা দেওয়া হয়। উপহারকে আরো নানা শব্দে বা প্রতিশব্দেও বুঝানো হয়ে থাকে, যেমন উপঢৌকন, ব্যাভার ইত্যাদি। তবে উপলক্ষ্য ও অঞ্চল ভেদে উপহারের এই শব্দগুলি ভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে মোট কথা হল এই যে, উপহার হল প্রকৃতপক্ষে ভালবাসা, স্নেহ-আদার, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরম মাধ্যম।

উপহার দিতে এবং পেতে আমরা সবাই পছন্দ করি। আমরা বিভিন্ন উপলক্ষে একে অন্যকে উপহার দিয়ে থাকি। উপহার বিনিময়ের মধ্যদিয়ে আমরা একে অন্যকে স্মরণ করি এবং পরস্পরের স্মরণীয় দিনগুলিকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলি। আমাদের জীবনের বিশেষ বিশেষ দিনগুলি যথা জন্মদিন, বিবাহ, বিবাহবার্ষিকী, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের দিন, সাক্রামেন্ত গ্রহণের দিন এবং আরো অনেক অনেক বিশেষ দিনে আমরা উপহার বিনিময় করি। আমরা যেমন উপহার দেই তেমনি উপহার পেতেও পছন্দ করি। বিভিন্ন সময় নিমন্ত্রণ রক্ষা করার ক্ষেত্রেও হাতে উপহারের ডালি থাকে। এমন কি এমন অনেকেই আছেন যে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারলেও, নিজের আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য উপহারখানা কোন মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়। মনে করা হয়, আমার উপহারই যেন আমার প্রিয়জনের কাছে আমার উপস্থিতি। আমার উপস্থিতির অপারগতায় আমার উপহারের সান্নিধ্য দিতে পেরেই যেন আমার স্বস্তি। সেই ক্ষেত্রে উপহার যেন কোন দ্রব্য বস্তু নয়; কিন্তু একজন ব্যক্তির উপস্থিতিই উপলব্ধি হয়।

বড়দিনের একটা গুরুত্বপূর্ণ আনন্দ সহভাগিতার দিক হল বড়দিনের উপহার বিনিময়। উপহার আদান প্রদান ছাড়া বড়দিনের উৎসব যেন অনেকাংশে অপূর্ণই থেকে যায়। আমার মনে পড়ে যখন বয়সে ছোট্ট ছিলাম, পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি সবে মাত্র। সেই বয়সে বড়দিনে উপহার দেওয়ার কথা কখনো তেমনভাবে ভাবিই নি, শুধু উপহার পেতাম ও পাবার আশায়ই থাকতাম আর সত্যি বলতে কি যা কিছু পেতাম তা যে উপহার তাও বুঝতাম না। সেই সময় ধর্মক্লাশে একদিন ব্রাদার আমাদের বললেন এই বছর বড়দিনে তোমরা তোমাদের মা'কে তোমাদের জমানো পয়সা (পয়সা বললাম, কারণ তখন আমরা টাকার চেয়ে পয়সার হিসাবই বেশী করতাম) থেকে কিছু একটা কিনে উপহার হিসাবে দিবে। সেই বড়দিনে মা'কে সামন্য কয়টা কাঁচের চুঁড়ি উপহার দিতে পেরে কি যে আনন্দ হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এরপর বড় হওয়ার সাথে সাথে এই জীবনে কত উপহার পেয়েছি আর দিয়েছি কিন্তু আজও সেই দিনটাই শ্রেষ্ঠ উপহারের দিন হিসাবে অমলিন হয়ে আছে হৃদয়-মন্দিরে। আমরা সাধারণত আমাদের কাছের মানুষদেরকেই উপহার দেই। আর যদিও বা প্রতিদানের আশা ব্যতীরেকেই উপহার দিয়ে থাকি তবুও একটু প্রত্যাশা হৃদয় কোণে উঁকিঝুঁকি মারতেই থাকে যে আমি কোন

ফিরতি উপহার হয়তো পাব! আবার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, যখন কারও কাছ থেকে কোন কিছু উপহার হিসাবে পাই তখন প্রতিদান হিসাবে না হলেও, আমরা উপহারের বিনিময়ে আপ্রাণ চেষ্টা করি উপহার দিতে। তখন উপহার দেওয়াটা যেন আমাদের কর্তব্যের মধ্যে এসে পড়ে। এটা ঠিক ঋণ শোধ নয় বা প্রতিদানও নয়, তবে বলা চলে উপহারের বিনিময়ে উপহার; সম্পর্কের আদান প্রদান বা উল্টো উপহারের মধ্যদিয়ে প্রাপ্তিস্বীকারও বলা যেতে পারে।

একটুখানি খেয়াল যদি করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের বড়দিনের কেন্দ্র বিন্দুও কিন্তু এই উপহার। বড়দিনের এই মুহূর্তে যখন আমরা উপহার দেয়া নেয়া নিয়ে ব্যস্ত তখন আমরা ভুলেই যাই যে আসলে আমরা কেন বড়দিনের উপলক্ষে উপহার আদান প্রদান করি। উপহার আদান প্রদানের নিগুঢ় রহস্য হল স্বয়ং ঈশ্বর নিজেই। কেননা তিনি নিজেই আমাদের জন্য উপহার হয়ে এসেছেন। তিনি যে দিন আমাদের কাছে উপহার হয়ে ধরা দিয়েছেন সেই দিনটা আমাদের কাছে বিশেষ দিন এবং এই 'উপহার' ও দিন দুটোই আমাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরে বলে এই দিনের নাম আমরা দিয়েছি 'বড়দিন'। এই দিনে তিনি তাঁর আপন পুত্রকে এই জগতে, গোটা মানবজাতির জন্য উপহার হিসাবে দিয়েছেন। তিনি তাঁর পুত্রকে উপহার হিসাবে প্রেরণ করে স্বর্গদূতের মধ্যদিয়ে সেই সংবাদ আমাদের কাছে ঘোষণা করলেন- "আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ সমস্ত জাতির মানুষের জন্যই সঞ্চিত হয়ে আছে। আজ দাউদ নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা-জন্মেছেন তিনি সেই খ্রিস্ট, স্বয়ং প্রভু *(লুক ২:১০-১১)*।"

আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মানুষের কাছে নানা কারণে ঋণী থাকি, অকৃতজ্ঞ হই। মানুষের উপকার অনেকবার স্বীকার করি না। সাহায্যকারীকেও অবহেলা করি, অনেকবার অন্যের উপকার মনেও রাখি না। কিন্তু উপহারের ক্ষেত্রেই মনে হয় এর ব্যতিক্রম ঘটে। আমরা কারও কাছ থেকে উপহার হিসাবে কিছু পেলে তার প্রতি-উপহার দিতে বিলম্ব করি না। যদিও উপহারের প্রতিদান দেওয়া জরুরী নয়, কিংবা এর জন্য কেউ কোন প্রশ্ন তুলবে না, তাগাদা দিবে না বা প্রত্যাশাও করবে না। তবুও আমরা ব্যাকুল হয়ে উপলক্ষ্য খুঁজি প্রতিদানে উপহার দেওয়ার। আর বড়দিনের মতো উৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা সেই উপহার দেওয়ার সুযোগ করে নেই। আমরা পরস্পরের উপহারের প্রতিদানে উপহার দিয়ে ঋণ শোধ করার প্রবল চেষ্টা চালাই বটে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের এমন একটা উপহার দিলেন যার প্রতিদানে আমরা তাঁকে কিছুই দিতে পারি না। কত বড় সেই উপহার! কত বড় প্রাপ্তি, যে আমাদের নির্লজ্জ পাপ ও অনন্ত মৃত্যুর প্রতিদানে ঈশ্বর, আমাদের জন্য তাঁর আপন সন্তানকে উপহার হিসাবে দিলেন। তিঁনি পৃথিবীর মুক্তিদাতা হিসাবে তাকে মর্তে মরতে দিলেন।

আমরা যখন বড়দিনে আমাদের বন্ধু ও আমাদের পরিবারের অন্যদের বড়দিন উপলক্ষে উপহার প্রদান করি তখন আমরা মনে রাখতে পারি যে, শুধুমাত্র বাহ্যিক উপহার নয়, কিন্তু বড়দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপহার হল যিশুর আগমনের কথা ঘোষণা করা। যিশুর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করা এবং সাক্ষ্য বহন করা। আমরা বড়দিনের উপহার দেই ঠিকই, কিন্তু অনেকেই এই উপহারের আসল মাহাত্মটাই ভুলে যাই। একে অপরকে অনেক কিছু দেই, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু প্রকৃত বার্তা দিচ্ছি না বা দিতে পারছি না। যখন আমরা প্রকৃত সংবাদ বিহীন উপহার দেই, তখন তা বাহ্যিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন তা উপহার না হয়ে শুধুই একটা ব্যবহারের জিনিস হয়ে ওঠে।

বড়দিন হল ঈশ্বরের উপ্চে পড়া উদারতা, দয়া, অনুগ্রহ, ভালোবাসা। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজেই আমাদের জন্য উপহার হয়ে এসেছেন। অন্য কথায় ঈশ্বর মানুষের জন্য উপহার হিসাবে ঈশ্বরকে দিয়েছেন (ত্রিত্ব পরমেশ্বর পুত্র ঈশ্বরকে মানুষ রূপে প্রেরণ করেছেন)। ঈশ্বরের ভালোবাসার উপহারের কোন কমতি নেই- "ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, তাদের কার-ও যেন বিনাশ না হয়, বরং তারা সকলেই যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন *(যোহন ৩:১৬)*।"

ঈশ্বর বেথলেহেমের গোয়াল ঘরে আমাদের জন্য তার আপন পুত্রকে উপহার হিসাবে দিয়েছেন। এই উপহার শুধুমাত্র এই জগতে খণ্ডকালীন, ক্ষণস্থায়ী উপহার নয়, কিন্তু স্বর্গে অনন্ত জীবন লাভের প্রতিশ্রুত উপহার। ঈশ্বরের এই অনুগ্রহ দান আমাদের জন্য স্বর্গের পক্ষ থেকে জগতের মানুষের জন্য ভালবাসার নির্দশন, এক অনন্য, অপরূপ উপহার। খ্রিস্টের জন্মতিথিতে স্বর্গদূতেরা আনন্দ কীর্তনে মেতে উঠেছিল, রাখালেরা শিহরিত হয়ে পড়েছিল, পণ্ডিতেরা দিশেহারা হয়ে খুঁজছিল। পণ্ডিতেরা শিশুযিশুকে খুঁজে পেয়ে তাদের ভাণ্ডার উজার করে, অঞ্জলি ভরে সবকিছু উদারভাবে তাঁর চরণে ঢেলে দিয়েছিল। এই জগতে ঈশ্বরের দেহধারণের, আগমনের উপলক্ষে পণ্ডিতেরাই জগত ও মানবজাতির পক্ষে সর্ব প্রথম উপহার জ্ঞাপন করে। তারা উপহার হিসাবে ধূপ, গন্ধ নির্যাস আর সোনা তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণিপাত করে। ঈশ্বর আমাদের জন্য নিজেকে দিয়েছেন: নিজেকে দেওয়ার চেয়ে বড় উপহার আর কি হতে পারে?

প্রত্যেক বছর আমরা বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন করি, গোশালা ঘর সাজাই, ক্রিস্টমাস ট্রি সাজাই। এগুলির মধ্যে উপহার রাখি। ক্রিস্টমাস ট্রি'তে কত রকম মনি-মুক্তার আদলে কৃষ্টি-সংস্কৃতির, রীতি-নীতি অনুসারে উপহাররূপ খেলনা বেঁধে রাখি। সান্তাক্লজ তো পুরোপুরিই উপহারের মূর্ত প্রতীক হিসাবে ঘুর্ণায়মান বড়দিনকাল ব্যাপি। বড়দিনের পূর্ব থেকেই বিভিন্ন বড়দিন উৎসবে জীবন্ত সান্তাক্লজের আনাগোনা আমাদের নজর কাড়ে। তাদের ঝোলা থেকে নানা উপহার শিশুদের দিয়ে যিশুর ভালোবাসা বিলোয়। আমাদের সেই কথা স্মরণ করায় যে ঈশ্বর আমাদের উপহার দিয়েছেন। পিতা-মাতা হিসাবে আমরা সন্তানদের উপহার দেই। সন্তানেরাও পিতা-মাতাকে দেয়। আত্মীয় পরিজন, বন্ধুমহল একে অন্যের জন্য নানা উপহার নিয়ে হাজির হয় বড়দিনে। যা খুবই সুন্দর একটা রীতিতে পরিণত হয়েছে, এই রীতি অত্যন্ত হৃদয়কাড়া, মনোহরা এবং একই সঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যা বড়দিনের মর্মার্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

বড়দিনে যিশু নিজে আমাদের জন্য তাঁর জীবন উপহার হিসাবে দিয়েছেন। আমাদের প্রতিদিনের বেঁচে থাকা, তা তো ঈশ্বরের দান, এইটা একটা উপহার, আমাদের চারিদিকে যা আছে, যারা আছে, সবই ঈশ্বরের নিকট হতে আমাদের জন্য উপহার। ঈশ্বরের উপহারের প্রতিদানে আমরা আসলে কোন কিছুই দিতে পারি না। তাই আমরা যখন পরস্পরের প্রতি আমাদের উপহার প্রদান করি, ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করি, তাঁর প্রতি আমাদের ধন্যবাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি; তা হতে পারে আমাদের জন্য তাঁর প্রতি ক্ষুদ্র উপহার প্রদানের প্রচেষ্টা। ঈশ্বর নিজেকে দিয়েছেন, নিজেকে দেওয়ার চেয়ে বড় উপহার আর কি হতে পারে! আমরাও নিজেরা ঈশ্বর ও মানুষের কাছে উপহার হিসাবে নিজেকে উপস্থিত করতে পারি, এইভাবে বড়দিন উদ্‌যাপন, উপহার প্রদান আমাদের জন্য হতে পারে স্বার্থক বড়দিন, প্রকৃত উপহার আদান-প্রদান॥

সবার জীবনে ‘বড়দিন’ কি সত্যিই বড়দিন!

কমল পালমা

বড়দিন দিনটি কি? আমরা যদি ইংরেজিতে অনুবাদ করি তাহলে বড়দিন হলো এ বিগ ডে (a big day) । যদি আক্ষরিক অর্থে দেখি তাহলে বড়দিন মানে হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ অথবা অর্থপূর্ণ দিন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বা অর্থপূর্ণ দিন বলতে আমরা কি বুঝি? গুরুত্বপূর্ণ বা অর্থপূর্ণ দিন বলতে আমরা সেই দিনকে বুঝাই যে দিন আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটে। একজন মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে পারে বিয়ের দিন, একটি দম্পতির জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে পারে তাদের প্রথম সন্তানের জন্মদিন, কারো জীবনে আবার গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে পারে একটি ভালো চাকরী পাবার দিন। যিশুর জন্মদিন কেন আমাদের জীবনে বড়দিন বা গুরুত্বপূর্ণ দিন? *“বরং নিজেকে তিনি রিক্ত করলেন; দাসের স্বরূপ গ্রহণ ক’রে তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন (ফিলি ২:৭।”* সুতরাং বড়দিন হলো আমাদের নিজেদের হৃদয়কে রিক্ত করার দিন। রিক্তহৃদয় কি? রিক্ত হৃদয় হলো শূন্য হৃদয়। ফিলি ২:৭ পদে আমরা দেখি যে, তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন এবং দাসের রূপ নিলেন। কিন্তু আমরা কি ভাবে নিজেকে রিক্ত করবো এবং নিজেকে রিক্ত করার মানেই বা কি? কেনই বা আমরা নিজেকে রিক্ত করবো। নিজেকে রিক্ত বা শূন্য করার প্রথম ধাপ হলো আমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পূর্ণ করা। ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা শুধু নিজেকে পূর্ণ করলেই হবে না, ঈশ্বরের বাক্যানুযায়ী জীবনধারণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত আমরা নিজেদেরকে রিক্ত করতে পারি ঈশ্বরের আদেশ পালনের মাধ্যমে। ঈশ্বর আমাদের দু’টি আদেশ দিয়েছেন যা দ্বারা আমরা নিজেদেরকে রিক্ত করতে পারি। *“গুরু, বিধানের শ্রেষ্ঠ আদেশ কোনটি?” যীশু উত্তর দিলেন: “তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে। এটিই হল বিধানের শ্রেষ্ঠ ও প্রধান আদেশ। আর দ্বিতীয়টিও এরই মতো: ‘তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালবাসবে (মথি ২২:৩৬-৩৯)।”* প্রথম আদেশ হলো আমাদের সমস্ত হৃদয়, সমস্ত আত্মা এবং মন দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসতে। এর মানে হলো আমাদের ধ্যান, জ্ঞান এবং কর্মে পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করা। আমরা যখন সত্যিই কাউকে ভালবাসি সারাক্ষণ তার কথা চিন্তা করি। তার

ছবি: ইন্টারনেট

কথা অনুযায়ী চলি। এমনকি ভালোবাসার মানুষের চোখ দেখে আমরা বুঝতে পারি সে কি বলতে চায়। আমরা এমন কিছু করি না যা ভালোবসার মানুষের কষ্টের কারণ হয়। ভালোসার মানুষকে সবসময় ভালো রাখার চেষ্টা করি। আমরা যখন কাউকে ভালোবাসি তার দোষত্রুটি ক্ষমা করি এবং তাকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনি। ঠিক তেমনি আমরা যখন নিজেকে রিক্ত করে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারবো তখন ঈশ্বরের বাক্য আমরা সারাক্ষণ আমাদের জ্ঞান এবং ধ্যানে অনুধ্যান করবো। তার বাক্য অনুযায়ী চলবো এবং তাঁর ইচ্ছার কাছেই নিজেকে সমর্পিত করবো, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগে গেৎসিমানী বাগানে যিশু যেমনটি করেছিলেন। তিনি পিতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করছিলেন, “পিতা আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক *(লুক ২২:৪২)*।” ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারলে ঈশ্বর আমাদের কাছে কি চান তা জানতে পারবো এবং এমন কিছুই করবো না যা ঈশ্বরের কষ্টের কারণ হয়। দ্বিতীয় আদেশ হলো “তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মতো করে ভালবাসবে।” প্রতিবেশিকে ভালোবাসার আগে আমাদের নিজেদেরকে আগে ভালোবাসতে হবে। কিন্তু কি ভাবে আমরা নিজেদেরকে ভালোবাসতে পারবো? ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্য মেনে ঈশ্বরের পথে চলাই হলো নিজেকে ভালোবাসা। আমরা যখন নিজেকে ভলোবাসবো তখন যা কিছু আমাদের দেহ মন এবং আত্মার জন্য শুভ, কল্যাণকর, এবং মঙ্গলময় তাই আমরা করবো। ঠিক তেমনি ঈশ্বর আমাদের আদেশ দিয়েছেন আমাদের প্রতিবেশিকে আমাদের নিজেদের মত ভালোবাসতে। কিন্তু প্রশ্ন হলো আমাদের প্রতিবেশি কে বা কারা? আমরা যদি লুক ১০:২৫-৩৭ পড়ি তাহলে বুঝতে পারবো আমাদের প্রতিবেশি কে বা কারা। সাধারণত প্রতিবেশি বলতে আমরা বুঝি আমাদের বাড়ির আশে পাশে যারা বসবাস করেন। কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে আমার সাহায্য যার প্রয়োজন, হোক সে আমার অপরিচিত তিনিই হলেন আমার প্রতিবেশি। ভালোবাসা মানেই হলো নিজেকে রিক্ত করা। নিজেদেরকে রিক্ত করার আরেকটি উপায় হলো আমরা যাকে ভালোবাসি তার কথা শোনা। শোনা মানে শুধু কান দিয়ে শোনা নয়, আমরা যখন কারো কথা শুনি তার মানে হলো তার কথা মতো জীবন-যাপন করি। *“তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে তোমরা আমার সমস্ত আদেশ পালন করবে (যোহন ১৪:১৫)।”* স্বর্গদূত গাব্রিয়েল

মা মারীয়ার কাছে যখন ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন, মা মারীয়া তখন বলেছিলেন, *"আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক!" স্বর্গদূত তখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন (লুক ১:৩৮)।"* মা মারীয়া তাঁর সমস্ত মন প্রাণ এবং হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পেরেছিলেন বলেই ঈশ্বরের বাক্য তাঁর মাঝে দেহ ধারণ করেছিল।

আমরা যদি যিশুখ্রিস্টের জন্ম কাহিনী শুদ্ধ হৃদয় নিয়ে পড়ি তাহলে বুঝতে পারবো যে যিশু ঈশ্বরের পুত্র হয়েও কোন রাজপ্রাসাদে জন্ম নেননি। তিনি একটি গোশাল ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন এবং তার বিছানা ছিল জাবপাত্র। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে রিক্ত করেছেন। কিন্তু আমরা বর্তমান জগতে ভোগ বিলাসিতার কাছে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়েছি। বর্তমান সমাজে বড়দিন হলো ভোগবিলাসিতার মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। বড়দিনে আমরা নতুন কাপড় পড়ি, বাড়ি-ঘর সাজাই কিন্তু আমাদের প্রতিবেশির খোঁজ-খবর নিতে ভুলে যাই। খ্রিস্টান হিসাবে, এই বিশ্বের জিনিসগুলিতে আমাদের আস্থা রাখার বিষয়ে নতুন নিয়মের মাধ্যমে আমাদের সতর্ক করা হয়েছে। এই বিশ্ব যা দেয় তার সাথে খুব বেশি সংযুক্ত হওয়ার বিষয়ে আমাদের সতর্ক করা হয়েছে। এই পৃথিবীর প্রলোভন প্রতিরোধ করার বিষয়ে এত কিছু লেখার কারণ হল যে, আমরা এই জীবনের এমন জিনিসগুলি দিয়ে পরিপূর্ণ করি যা আমাদেরকে তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তি দেয়। বর্তমানে টেলিভিশনে তাতক্ষণিক পরিতৃপ্তি দিয়ে মানুষের মন ভরিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানা রকম বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। যা আমাদের মনোযোগ ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সড়িয়ে নেয়। পালাক্রমে, আমরা ঈশ্বরের পরিবর্তে সেই জিনিসগুলিতে মনোনিবেশ করতে শুর করি, যিনি আমাদের সমস্ত জিনিসকে পরিমিতভাবে উপভোগ করতে দেন। নতুন নিয়মে যাকোবের পত্রাবলিতে আমাদের জন্য কিছু ব্যবহারিক উপদেশ রেখেছেন যা আমাদের সাহায্য করে কীভাবে আমরা জাগতিক জিনিসের সাথে খুব বেশি সংযুক্ত না থেকে ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হতে পারি। *"যে মহৎ নাম উচ্চারণ ক'রে তোমাদের দীক্ষিত করা হয়েছে, তারাই কি সেই নামের নিন্দা করছে না?...অবশ্য "তোমার প্রতিবেশিকে তুমি নিজের মতোই ভালবাসবে", শাস্ত্রে এই যে-বিধান রয়েছে, তোমরা যদি সেই রাজকীয় বিধান মেনে চল, তাহলে ভালই করছ। তবে যদি কারও প্রতি কোন রকম পক্ষপাতিত্ব দেখাও, তাহলে কিন্তু তোমরা পাপই করছ; সে ক্ষেত্রে বিধানও তোমাদের অপরাধী বলে প্রতিপন্ন করছে (যাকোব ২:৭-৯)।"*

১। ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা এবং তার আনুগত্য স্বীকার করা: যখন আমরা প্রথম আদেশ সম্পর্কে চিন্তা করি এবং কীভাবে আমাদের সর্বদা ঈশ্বরকে প্রথম স্থানে উন্নীত রাখি, তখন আমরা প্রমাণ করি যে তাঁর বাকি আদেশ (আজ্ঞাগুলি) মেনে চলার চেষ্টা করি। এটি করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বর এবং বিশ্বকে দেখাই যে আমরা আমাদের ইচ্ছার উপরে তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করি এবং তার আনুগত্য স্বীকার করি ।

২। শয়তানকে প্রতিরোধ করুন: শয়তানের প্রভাব আমরা যেখানেই দেখি সেখানেই রয়েছে। তার সেরা এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী কাজ প্রচারের আকারে আসে। এমন অনেক মুখপত্র রয়েছ যা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে শয়তাকে প্রচার করে। এটি হতে পারে সামাজিক নিয়ম বা আমরা যে বস্তুবাদী সমাজে বাস করি, শয়তানের অনেক উকিল আছে যারা আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে একজন ব্যক্তির পক্ষে সর্বোত্তম জীবন-যাপনের জন্য শয়তানের পথ অনুসরণ করা উচিত। বর্তমনে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই শয়তান কি ভাবে তার বাক্য প্রচার করে যাচ্ছে। খ্রিস্টান হিসাবে আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের উপর নির্ভর করলে আমরা কী করে শয়তানের বাক্য প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবো।

৩। ঈশ্বরের কাছাকাছি আসুন: নিয়মিত ঈশ্বরের উপাসনা ঘরে যান। উপাসনাঘর বলতে শুধু গির্জা বুঝায় না উপাসনাঘর বলতে আমাদের শরীর, দেহ এবং মনকেও বুঝায় (you are the temple of God)। আমরা বর্তমানে এত কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়েছি যে আমাদের নিজেদের ভিতরে আমরা প্রবেশ করার সময়ই পাই না। এমনকি আমাদের নিজেদের চেহারা আমরা আমাদের মনের মধ্যে আনি না যতবার না অন্যের চেহারা আমরা কল্পনা করি। নিয়মিত পবিত্র বাইবেল পাঠ করুন এবং পবিত্র বাইবেলের আলোকে নিজের জীবনকে পাঠ করুন। প্রভুর টেবিলে আসুন এবং তাঁর ভোজে অংশগ্রহণ করুন। একটি দৈনিক ভক্তিমূলক কাজ করুন সেটা হতে পারে ঈশ্বরের সৃষ্টির যে কোন কিছুর জন্য এবং খ্রিস্টীয় জীবন-যাপনে সাহায্য করে এমন বই পড়ুন। যেমন: বিভিন্ন সাধু সাধ্বীর এবং মহৎ ব্যক্তির জীবনী।

৪। আপনার হাত পরিষ্কার করুন: সুস্থ থাকার জন্য খাবারের আগে আমরা সর্বদা ভালো ভাবে হাত ধোয়ার জন্য চেষ্টা করি। তবে সাধু যাকোব হাত ধোয়া বলতে বুঝিয়েছেন আমাদের ঈশ্বরের কাছে আসতে হবে এবং খ্রিস্টের রক্তের মাধ্যমে আমাদের ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

৫। আপনার হৃদয় শুদ্ধ করুন: সাধু যাকোব এখানে দ্বিমুখী অথবা দ্বিমনা হওয়ার কথা বলেছেন। দ্বৈত মনের মানুষ এক কথা বলবে আর কাজ করবে অন্য। তিনি কপট জীবন-যাপনের কথা বলছেন। অনেকে আমরা রবিবারে গির্জায় যাই কিন্তু সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত একটি পৌত্তলিকের মতো জীবন-যাপন করি, এটিই দ্বিমনের জীবন যা শুদ্ধ করা দরকার।

৬। বিলাপ করুন এবং কাঁদুন: এটি পর্বতে যিশুর উপদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। "ধন্য তারা যারা শোক করে, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে *(মথি ৫:৪)।"* এখানে বিলাপ করার অর্থ হল যে, আপনি যখন আপনার ভাঙা পাপপূর্ণ অবস্থার জন্য শোক করেন তখন আপনি ধন্য হন। এটি এমন একটি মানসিকতা যা পাপপূর্ণ জীবনের জন্য প্রকৃত অনুশোচনা এবং দুঃখ অনুভব করে। আমাদের সমাজে বর্তমানে এমন অনেকেই আছেন যারা পাপ কাজ করে নিজেকে গর্বিত মনে করে। কিন্তু প্রতিটি পাপ কাজের জন্য আমাদের হিসেব দিতে হবে। সুতরাং পাপের জন্য গর্ববোধ না করে আসুন পাপ পরিহার করি এবং অনুতপ্ত হই।

৭। ঈশ্বরের সামনে নিজেদেরকে নম্র করুন: কোনো না কোনো ভাবে আমরা সকলেই আমাদের জীবনে কিছু গুণের জন্য গর্বিত হতে থাকি এবং অনুভব করি যে আমরা নিজেরাই এটি তৈরি করেছি। গর্ব ছিল এদেন উদ্যানে প্রথম দিকে মানব জাতির পতন। সেই বাগানে আদম এবং হবা শয়তানের মিথ্যাকে বিশ্বাস করেছিলেন যে, ঈশ্বর তাদের কাছ থেকে প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান বন্ধ করে রেখেছিলেন এবং তাদের আরও ভাল জীবন-যাপনের জন্য এটি প্রয়োজন ছিল *(মিকা ৬:৮)*।" কিন্তু বাস্তবিকভাবে প্রকৃত জ্ঞানী মনুষ নম্র এবং বিনয়ী হয়।

আসুন আমরা এই বড়দিনে নিজেদেরকে সমস্ত জাগতিকতা থেকে মুক্ত করে পাপ করা থেকে বিরত থাকি এবং সর্বোপরি নিজেদেরকে রিক্ত করে ঈশ্বর এবং মানুষকে ভালোবাসতে শিখি॥

পোপ ফ্রান্সিসের ভাবনায় বড়দিন

ফাদার এলিয়াস সরকার এসজে

ছবি: লিটন আরিন্দা

"অন্ধকারে পথ চলছিল যারা, সেই জাতির মানুষেরা দেখেছে এক মহান আলোক" প্রবক্তা ইসাইয়ার এই কণ্ঠস্বর হাজারো বছর ধরে প্রতিধ্বনিত্ব হচ্ছে। এই কণ্ঠস্বর প্রতিটি বছর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বড়দিনের তথা যিশুর আগমনের তাৎপর্য। পূণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণায় এই কণ্ঠস্বর বর্তমান প্রেক্ষাপটে আরও জোরালো হয়েছে। তার প্রগতিশীল ভাবনা ও মানবিক দৃষ্টিকোণ আমাদের তথা মণ্ডলীকে আলোর পথে চলতে আহ্বান ও উৎসাহিত করে।

যিশু কেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন- এই প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি। প্রবক্তা ইসাইয়া আমাদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন সাবলীল ভাষায় এবং মণ্ডলী আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন তা বিশ্বাস ও ধারণ করতে। আর এই প্রাবক্তিক শিক্ষার ধারা চলমান ও অক্ষুন্ন রেখেছেন পোপ ফ্রান্সিস তার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই। জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে তিনি মুক্তির বাণী সহভাগিতা করছেন। তার কাছে যিশু সেই আলো যা আমাদের মনের ও সমাজের সকল অন্ধকার দূর করে দেয়।

যিশু হচ্ছেন অন্ধকারে পথ চলা আলোকিত মানুষের আলো। তাঁর আলোতেই মানব জাতির অস্তিত্ব ও মানব ইতিহাস অর্থবহ হয়ে উঠেছে। ঈশ্বর আমাদের ভালোবেসে তাঁর পুত্র যিশুকে পাঠিয়েছেন আমাদের অন্ধকার জগৎকে অলোকিত করতে। আর সেজন্য স্বর্গদূতেরা রাখালদের বলেছিলেন,"ভয় করোনা"। যিশু নিজেই আমাদের বলেছেন, "ভয় করোনা"। যিশুর আলোতে ও ঈশ্বরের ভালবাসায় আস্থা রেখে পোপ ফ্রান্সিসও আমাদের নির্ভয়ে পথ চলতে আহ্বান করেছেন কারণ ঈশ্বর হচ্ছেন ক্ষমা এবং আমাদের শান্তি।

পোপ ফ্রান্সিসের মতে বড়দিন হচ্ছে ভালবাসার উৎসব যা আমাদের জন্য যিশুখ্রিস্টে জন্মগ্রহণ করে। যিশু নিজে ভালবাসা হয়ে আমাদের মাঝে এসেছেন। এই ভালবাসা কোন ভেদ বোঝে না। এই ভালবাসা নিঃস্বার্থ। এই ভালবাসার উৎসবের প্রাণকেন্দ্র নিঃসন্দেহে যিশু। কিন্তু আমরা আমাদের বড়দিনের আমেজে যিশুকে বাদ দিয়ে দেই, তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখি। যিশু বিনা বড়দিন শুধুমাত্র একটি শূন্য উৎসব কারণ বড়দিন মানেই যিশু। পূণ্যপিতা আমাদের অনুরোধ করেছেন যেন বড়দিনে আমরা যিশুকে সরিয়ে না রাখি! তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন যখন আমরা বড়দিনে পরিবারের সাথে গোশালার সামনে প্রার্থনা করি, তখন আমরা যেন শিশু যিশুর কোমলতার স্পর্শ আমাদের হৃদয়ে অনুভব করি।

পূণ্যপিতার মতে সত্যিকারের বড়দিন হচ্ছে উদারতা কারণ ঈশ্বরপুত্র দরিদ্র এবং নম্র হয়ে আমাদের তাঁর ভালবাসা দিতে তিঁনি মানবজন্ম গ্রহণ করেছেন। আমরা যখন এই ভালবাসা গ্রহণ করি অর্থাৎ যিশুকে গ্রহণ করি তখন আমাদের মধ্যে বড়দিনের মহিমা বিকশিত হওয়ার লক্ষ্যে আমাদের পরমুখী করে। ভালবাসা এর নিজস্ব গুণে ও সত্তায় সর্বদা পরমুখী। এটি তরঙ্গের মত ধাবিত হয় একজন থেকে অন্যজনে। আর এটিই হচ্ছে উদারতা, ভালবাসার সহভাগিতা।

বড়দিন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ঈশ্বর আমাদের নগন্যতাকে, আমাদের ক্ষুদ্রতাকে ভালোবাসেন। তিনি আমাদের সামান্যতার মাঝে দান করেছেন তার অসামান্য অনুগ্রহ, যিশুখ্রিস্টকে। যিশু এসেছেন পথহারাদের খুঁজতে। পোপ ফ্রান্সিসের মতে তাঁকে খোঁজার চেয়ে যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে যিশুকে সাহায্য করা যেন তিনি আমাদের খুঁজে পেতে পারেন। আর আমরা যখন উপলব্ধি করতে পারব যে আমরা তাঁর সামনে অতি নগণ্য তথাপি তিঁনি আমাদের সামান্যতাকে ভালবাসেন, আমাদের নগণ্যতাকে গ্রহণ করেন তখন আমরা নিজেদের আর তাঁর কাছ থেকে দূরে রাখতে পারব না। আমরা আমাদের হৃদয় মন্দিরে তাকে স্থান দেব।

যিশুর জন্ম আমাদের পতিত অবস্থা থেকে উত্থানের কারণ। সাধু আথানাসিউস বলেছেন, "ঈশ্বরপুত্র মানুষ হয়েছেন যেন আমরা ঈশ্বর হতে পারি।" যিশুর জন্ম আমাদের আনন্দের কারণ। তিঁনি আমাদের মাঝে এসে আমাদের মত সামান্য হয়েছেন। আমাদের মাঝে আশার বাণী হয়েছেন। শক্তি যুগিয়েছেন আমাদের প্রাণে যেন তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে আমাদের জীর্ণ-দশা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। তাই পোপ ফ্রান্সিসের মতে বড়দিন হচ্ছে পরাজয়ের গ্লানি ও দাসত্বের দুর্দশা থেকে আনন্দ ও সুখের পথে আমাদের যাত্রা। তিঁনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে আমরা আর পতিত নই এবং আমাদের এই যাত্রায় আমরা আর একা নই।

পোপ ফ্রান্সিসের বড়দিনের এবং নিত্যদিনের ধ্যান-ধারণায় কয়েকটি বিষয় বেশ পরিষ্কার

ভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে যাবপাত্রে শায়িত আমাদের ত্রাণকর্তাকে দেখতে আমাদের বের হতে হবে। তার জীবনের আলোকে এই বের হওয়া হচ্ছে মানুষের মাঝে যাওয়া কারণ যিশুকে পাওয়া যাবে দরিদ্র, অবহেলিত, হতাশাগ্রস্থ ও পাপী মানুষের মাঝে। মানুষের মাঝে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশের জন্য আমাদের তাঁকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে যেখানে তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। তাই পোপ বলেছেন যে মেষপালকদের মেষের সাথে থাকতে হবে। তিনি বলেন যে নৈরাশ্য, ভোগবাদ, পুঁজিবাদ ও অস্থিতিশীলতার এই বর্তমান পৃথিবীতে শিশু যিশু আমাদের শান্ত মনে ও শন্তিপূর্ণ ভাবে জীবন-যাপন করতে আহ্বান করেন। তিনি আরও আবেদন জানান যেন আমরা পাপীদের প্রতি নমনীয় হই, আত্ম-মূল্যায়নের মধ্যদিয়ে ঐশ ইচ্ছা নির্ণয় ও পালন করি এবং দৈনিক প্রার্থনার জীবন থেকে নিঃসরিত ধার্মিকতা, সহানুভূতি ও ক্ষমার চর্চা করি।

পুণ্যপিতা আমাদের উপলব্ধি করতে বলেছেন যে বড়দিনের নবজাতক আমাদের অনিমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে থাকেন যারা আমাদের শহরে, মহল্লায়, অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ায় এবং আমাদের দরজায় কড়াঘাত করে। তিনি আমাদের সাহস যুগিয়েছেন যেন খ্রিস্টের জন্য তথা আমাদের বাস্তু-ভিটাহীন দুঃস্থ ভাই-বোনদের জন্য আমাদের দরজা খুলে দিতে আমরা ভয় না করি। শিশু যিশুতে ঈশ্বর আমাদের আশার দূত ও অতিথিপরায়ণ হতে বলেছেন। যিশুতে নবজীবনের আশাই আমাদের প্রেরণা, আমাদের জীবনের ভিত্তি। অতিথির বেশে, শরণার্থীর বেশে পবিত্র পরিবার আসে আমাদের কাছে, আমাদের সুযোগ দান করেন তাঁকে সেবা করার। এর জন্য আমাদের প্রয়োজন অন্তর্দৃষ্টি যেন অন্যের কষ্ট, বেদনা ও প্রয়োজন আমরা খোলা চোখে দেখতে পারি এবং কোমল হৃদয়ে তা অনুভব করতে পারি।

বড়দিন হচ্ছে ভালবাসার উৎসব। এই ভালবাসা পোপ ফ্রান্সিস প্রকাশ করে চলেছেন তার প্রতিটি কথায় ও কাজে। তার ভাবনায় বড়দিন হচ্ছে ন্যায্যতার জন্ম, বড়দিন হচ্ছে বিশ্বাসের সূত্রপাত, বড়দিন হচ্ছে অবহেলিতদের প্রতি মুক্তির ঘোষণা, বড়দিন হচ্ছে দরিদ্রদের কাছে স্বর্গের প্রতিশ্রুতি, বড়দিন হচ্ছে নর-নারীর সাম্যতা, বড়দিন হচ্ছে নগণ্যদের বন্দনা, বড়দিন হচ্ছে জীবনকে আরও জীবন্ত করার আহ্বান। যিশু জন্মেছেন শাস্ত্রের বাণী পূরণ করতে। আর সেটা যিশু করেছেন প্রতিটি জীবনকে জীবন্ত করার মাধ্যমে। পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তা-চেতনায় যিশুর মত করে ভালবাসার বিধান পূর্ণ প্রকাশ পায়। মা মারীয়ার প্রতি ভক্তির মাধ্যমে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা, শিষ্যদের পা ধোয়ানোর তালিকায় অবহেলিতদের সংযুক্ত করা, ধর্ম ভাইদের একত্রিত করার প্রয়াস, যুবাদের প্রাণে খ্রিস্টবিশ্বাস জাগানো, ক্ষুদ্র দেশের মানুষের কাছে যাওয়া, শরণার্থীদের নিজ বাড়িতে স্থান দেওয়া, মণ্ডলীর বিশেষ দায়িত্বে ব্রত-ধারিনী ও সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের সংযুক্ত করা এবং শিশুদের স্নেহ করার নিদর্শনগুলো যেন যিশুর মত করে সকলকে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

যিশুর জন্ম সকল সৃষ্টির জন্য। সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির মাঝে বাস করেন। লয়োলার সাধু ইগ্নেসিয়াসের আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত হয়ে পোপ ফ্রান্সিস ঈশ্বরকে তাঁর সর্ব সৃষ্টির মাঝে অন্বেষণ করেছেন। মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সে যেন তার সমস্ত সত্তা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার সেবা করে। আর অন্যান্য সৃষ্টিগুলো তাকে সেই উদ্দেশ্য অর্জনে সাহায্য করে। সেজন্যই সাধু ফ্রান্সিসের ভাবনায় একাত্মতা প্রকাশ করেছেন পুণ্যপিতা "লাউদাতো সি" রচনার মধ্যদিয়ে সর্বসৃষ্টির যত্ন নেওয়ার আহ্বান করে; কারণ যিশুর আগমন শুধুমাত্র মানবের নয়, সর্ব সৃষ্টির পরিত্রাণের জন্য।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বড়দিনের এক শুভেচ্ছা বার্তাতে পুণ্যপিতা বলেছেন যে আমরাই বড়দিন হয়ে উঠি যখন আমরা প্রতিটি দিন নতুন করে জন্মগ্রহণ করি ও ঈশ্বরকে আমাদের হৃদয়ে স্থান দেই; যখন আমরা একে অন্যের বন্ধু ও ভাই-বোন হয়ে উঠি তখন আমরা তাদের কাছে বড়দিনের উপহার হয়ে উঠি; আমরাও উজ্জ্বল তারা হয়ে উঠি অন্যকে প্রভুর পথে নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে; আমরাও স্বর্গদূত হয়ে উঠি যখন আমরা বিশ্বে শান্তি, ন্যায়বিচার ও প্রেমের বার্তা প্রচার করি।

প্রবক্তা ইসাইয়ার সেই কণ্ঠস্বর যেন পোপ ফ্রান্সিসের মধ্যদিয়ে ধ্বনিত্ব হচ্ছে। যিশু আলোকিত মানুষের আলো, যিশু পোপ ফ্রান্সিসের আলো। তার ভাবনায় বড়দিন হচ্ছে আমাদের যিশুর সাথে মিলিত হওয়ার উৎসব, ঈশ্বরপুত্রের নম্র হওয়ার উৎসব, যিশুর ভালোবাসা অন্তরে ধারণ করে অন্যের সাথে তা সহভাগিতা করার উৎসব, বড়দিন হচ্ছে আমাদের আনন্দের কারণ। বড়দিনের আকাশে পুণ্যপিতা হলেন সেই উজ্জ্বল তারা যা আমাদের সকলকে পূর্ণতার পথে জীবন তীর্থে যাত্রা করতে শক্তি, আশা ও অনুপ্রেরণা যোগায়। আমাদের প্রতি পুণ্যপিতার আহ্বান ও অনুরোধ যেন আমরাও বড়দিনের সেই উজ্জ্বল তারা হয়ে উঠি।

তথ্য সহায়িকা:

1. https://bit.ly/3iCUfdC
2. https://bit.ly/3XUpC3H
3. https://bit.ly/3Vy2dDB
4. https://bit.ly/3VYaekZ
5. https://bit.ly/3F8Em66
6. https://bit.ly/3iHzDRD
7. https://bit.ly/3HdE8h1
8. https://bit.ly/3iEXkdf
9. https://bit.ly/3B8POxy
10. https://bit.ly/3iva6e6 .

খ্রিস্ট প্রভু এলেন

সুশীল মন্ডল

খ্রিস্ট প্রভু এলেন ভবে
ছোট্ট শিশু হয়ে,
রাখালগণে জেগে উঠল
ছিলো যারা ভয়ে।
ঢাক-ঢোল আর মাদল বাঁজিয়ে,
নৃত্য তালে তালে,
যিশু যে এসেছেন মানব রূপে,
দেখি চলো দলে দলে।
এসো এসো, এসো সবে
তাঁরই নিকটে যাই,
ঘুচবে তবে দুঃখ দুর্দশা,
দূর হবে যত সংশয়।।

ভালবাসা

সপ্তর্ষি

স্বর্গ থেকে ভালবাসা এলো নেমে,
ভালবাসা অতি সুন্দর,
ভালবাসা ঐশ্বরিক;
ভালবাসা জন্মেছিল শুভ বড়দিনে।
ফুটেছে ভালবাসার চিহ্ন আকাশের তারায়
ভালবাসা অবতার, ভালবাসা ঐশ্বরিক;
আমরা করি ভালবাসার উপাসনা।
ভালবাসা আমাদের জীবনের প্রতীক
ভালবাসা হলো তোমার আমার
ভালবাসাতে করবো সবাই বসবাস।

বড়দিন উদ্‌যাপন হল পরিবারের মহোৎসব

ফাদার লুইস সুশীল

শুরুর কথা: আমাদের দেশে ঈদের সময়, পূজার সময় কি দেখি? কত মানুষ তাদের পরিবারের টানে ভয়াবহ কষ্ট করে, ঝুঁকি নিয়ে পরিবারে ফিরে যান সবার সঙ্গে কিছু সময় আনন্দে, একতায় অতিবাহিত করতে। এভাবে তখন দেখা যায় সম্পর্ক, আন্তরিকতা গভীরতর হয়, পরস্পরের প্রতি টান, কর্তব্য, দায়িত্বশীলতা বাড়ে।

খ্রিস্টানগণ প্রতিবছর যিশুর জন্মদিন বড়দিন পালনের ব্যাকুল অপেক্ষায় থাকেন। একই উপলক্ষ্যে তারা আশা করেন ভাল খাওয়া, নুতন পোশাক, নাচ-গান, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, উপহার বিনিময়, উৎসব-উৎসব ভাব, সুন্দর উপাসনা, আত্মীয় মিলন-দর্শন, পারিবারিক সহভাগিতা ইত্যাদি। সত্যিই অনেক প্রত্যাশা, প্রস্তুতি-পরিকল্পনা ও অপেক্ষার পর বছরের এ বিশেষ দিনে পরিবারে প্রিয় আপনজনদের আগমন ও একত্রে বড়দিন উদ্‌যাপন এক সৌভাগ্য ও আনন্দের ব্যাপার। আর পরিবারে ছোটবড়, ধনী-গরীর, আনন্দে-উৎসাহে স্বপ্নের সে বড়দিন পালন করেন। হতে পারে অনেকে কাজের জন্যে সারা বছর বাইরে, দূরে, বিদেশে কর্মস্থানে থাকেন। বড়দিনে মাত্র তারা সেখান থেকে বাড়ীতে-পরিবারে প্রিয়জনের কাছে আসতে চেষ্টা করেন, সময় নেন বা সময় পান। তাদের নিজস্ব প্রস্তুতি নিয়ে বছরকার এদিনে এভাবে একে একে আত্মীয়-পরিবারের টানে বাড়ী ফিরতে শুরু করেন এবং পরিবারের সঙ্গে মিলিত হন গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনায়। ধীরে ধীরে পরিবার যেন এক একটি মিলন-মেলায় পরিণত হতে থাকে। দিন-ক্ষণ যতই ঘনিয়ে আসে বড়দিন ঘিরে পারিবারিক প্রস্তুতি ততই জোরালো ও দৃশ্যমান হতে থাকে। এভাবেই পরিবার হিসেবে সকলে বড়দিনে প্রবেশ করে।

বড়দিন হল পরিবারের মহোৎসব

উৎসব হল সকলে মিলে গভীর আনন্দ, সহভাগিতা, অন্তরঙ্গতা। বড়দিন খ্রিস্টান সমাজ, পরিবার, মণ্ডলী ও ভক্তের জীবনে এক অন্যতম মহাপর্ব। এটি হল মানুষের হৃদয়ের পর্ব। আসলে আমাদের দেশের বাস্তবতা অনুসারে বড়দিন হল পরিবারে সমবেত হবার এক মহোৎসব। বড়দিন হল আমাদের এক বিশেষ ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব। সত্যিই বড়দিন সবার মধ্যে অনেক আবেগ, অনুভূতি, আমেজ নিয়ে আসে। সাধারণতঃ সেখানে থাকে অনেক আনন্দ, মিলন, শান্তি ও উৎসবের ঘনঘটা। এ উৎসব তাই পরিবারে ও নানা আয়োজনে উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে।

যিশু শিশু হয়ে পরিবারে আসেন। এদিন আমাদের সবার জন্য পরিবারের দিন, সবাই একত্রে আসা ও আনন্দ-উৎসব করার দিন। শিশু যিশুকে ঘিরে মারীয়া-যোসেফের পরিবারে যেমন আনন্দ ছিল ঠিক একইভাবে আমাদের পরিবারে পরস্পর পরস্পরকে ঘিরে থাকে আনন্দ নানা সহভাগিতা-আদানপ্রদান। এটি হল যিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে বাৎসরিক আনন্দের উদ্‌যাপন। শিশুযিশু তো আমাদের পরিত্রাতা, বন্ধু, গুরু তাকে ঘিরে কি আমরা আনন্দ উৎসব করবো না? সকলে একত্রে মিলে মিশে এ পবিত্র সময় অতিবাহিত করবো না? এদিন যে যেখানে থাকেন সকলে চান; মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন অন্য আত্মীয়গণ যেন পরিবারে একত্রিত হয়ে এ দিন পালন করতে পারেন। আগামী বছর এদিন পাব কিনা কে জানে! বেঁচে থাকলে আগামী বড়দিনে আবার এভাবে একজন অন্যজনের জন্য তাকিয়ে থাকবে!

এদিন পরস্পরকে ভালবাসার দিন, গ্রহণ করার দিন, ক্ষমা করার দিন, সকলে নতুন যাত্রা শুরু করার দিন। উৎসব কি বা কিভাবে? উৎসব হল পরিবারের সকলে একত্রে আসা, আর মিলনে আনন্দ করা। যে যেখানে থাকবে সবাই বাড়ী আসবে আর একত্রে সব কিছু করবে।

-এদিন ঘিরে আমাদের নানা আনুষ্ঠানিকতা, সামাজিকতা সর্বত্র চলে আসছে। সত্যিই সর্বত্র থাকে কত আনুষ্ঠানিকতা আর নানা উৎসবের আমেজ! সেসব ঘিরে স্থান কাল-ভেদে মানুষ নানা পর্যায়ে মহাব্যস্ত। যেমন সেখানে থাকে সাজগোজ, ভোজন-পান, আনন্দ গান, সামাজিকতা, আত্মীয় পরিদর্শন, আশীর্বাদ গ্রহণ, দয়াকর্ম, আনন্দফুর্তি, ধর্ম-কর্ম, বিশ্রাম, পত্র পত্রিকা প্রকাশ, প্রতিযোগিতা, অন্যান্য অনুষ্ঠান-উৎসব। তবে চিন্তার ও বিশ্লেষণের বড় কথা হল: যিশু-জন্ম উৎসব আমাদের কোন্ কোন্ দিকে গুরুত্ব দিতে বলে? কিভাবে আমরা বড়দিন পালন করি বা করব? যাহোক, বাস্তবতার নিরিখে পরিবারে কীভাবে বড়দিন উদ্‌যাপন করা হয় বা হতে পারে তার কয়েকটি দিক দেখানোর চেষ্টা করা হল।

ক) আত্মীয় পরিদর্শন, পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়: বেশ কিছু ভক্ত রয়েছেন যারা সুন্দর সাজগোজ ক'রে হালকাভাবে বাড়ি বাড়ি ঘু'রে, আত্মীয় দর্শন, আশীর্বাদ গ্রহণ/প্রদান প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাকেন। এভাবেই অনেককেই দেখা যায় যারা এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি ঘু'রে উৎসবের আমেজে-আবেগে-আবেশে বড়দিন উদ্‌যাপন করেন আর সেভাবেই উৎসবমূখর পরিবেশে কিছু দিন অতিবাহিত করেন।

খ) নানা সামাজিকতা করা: বড়দিনে দেখা যায় অনেক পরিবারে বেশ কিছু মানুষ সামাজিকতা করে সময় কাটান। তারা একত্রে নানা ধরনের সহভাগিতা, হাসি তামাসা, বৈঠক, খেলা, প্রতিযোগিতা, কীর্তন, সাজগোজ (সান্তাক্লজ), আড্ডা-অনুষ্ঠান, উৎসব, উপলক্ষ পালন প্রভৃতি করতে খুব আনন্দ পান। অনেকের জন্য এসময় ছুটি থাকে- তাই আত্মীয়স্বজনগণ কাছে থাকেন। কারো কারো কাছে এসময় কিছু টাকাও থাকে তাই বড়দিন ঘিরে উৎসবের মাতামাতি, অনুষ্ঠানের জড়াজড়ি। বড়দিনের অনেক মূল্যবান সময় যেন এসবের ভেলায় সময় নদীতে ভেসে যায়। এভাবে বহু মানুষের সময়, শ্রম, অর্থ, জীবন, ক্ষয় হয়। ফলে এ সময় পরিবারে যে আন্তরিকতা, সুসম্পর্ক, সংলাপ আশা করা হয় তার অনেকখানিই আনুষ্ঠানিকতার ভিড়ে চাপা পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় বা অবহেলিতই থেকে যায়।

গ) পরিবার ঘিরে বড়দিন পালন: খ্রিস্টান সমাজে অনেকে আছেন যারা বড়দিনে কোথাও যান না- নিজেদের পরিবারে সকলের সঙ্গে থাকেন গল্পগুজব, শুভেচ্ছা-উপহার বিনিময়, খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-স্ফুর্তি, গান-বাজনা, বিশ্রাম, সহভাগিতা, আলাপ-আলোচনা, খেলাধূলা, পারিবারিক কাজ, একত্রে ভ্রমণ প্রভৃতিতে সময় পাত করেন।

তাই যার যার স্থান থেকে পরিবারে ফিরে আসা, পরিবারের সকলে সমবেত হওয়া, একত্রে গির্জায় যাওয়া, সম্পর্ক উপলব্ধি করা, পরস্পরকে উৎসাহিত করা, একত্রে খাওয়া, বিশ্রাম, গল্প করা, উপহার প্রদান, একত্রে প্রার্থনা করা, একত্রে ঘরবাড়ী পরিষ্কার করা, সাজানো, পরস্পরকে ক্ষমা করা, সহভাগিতা-আদান-প্রদান করা, স্মৃতিচারণ করা, খেলা, ভ্রমণ, গান করা, একত্রে কোন দয়ার কাজ করা, কোন পরিবার পরিদর্শন করা, কিছু

অসুস্থ্য, দুর্বল ব্যক্তিদের নিয়ে একত্রে আহার, সহভাগিতা প্রভৃতি হতে পারে। পরিবারের জীবন ও সম্পর্ক উন্নততর করতে অবশ্যই এসবের ভূমিকা আছে।

এভাবে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিকতা, সহভাগিতা, আদান-প্রদান প্রভৃতি বাড়ে, সাথে সাথে আরো অনেকের নানাভাবে উপকার হতে পারে সে পরিবারের মাধ্যমে। আর সেভাবে বড়দিন হতে পারে পারিবারিক এক মধুময় উৎসব, বার্ষিক আনন্দ মেলা। আর সকল পরিবারে এ আমেজ-আন্তরিকতা থাকলে যিশুর জন্মোৎসব পালন আরো কত না আনন্দের ও অর্থপূর্ণ হতো!

ঘ) আধ্যাত্মিক উদ্‌যাপন-দান-ধ্যান প্রার্থনা-ধর্ম-কর্ম: বড়দিন হল ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক মহোৎসব। বড়দিন উদ্‌যাপনের আধ্যাত্মিক দিক হল এক গভীরতম বিবেচনা। এদিন মুক্তিদাতা যিশু-জন্ম স্মরণ করতে পরিবারে অনেকে উপলব্ধি করেন যে, তারা ঈশ্বরের সন্তান, পরস্পর ভাই-বোন এবং তাদের এক অনন্তকালীন পরিণতি আছে। সেসব উপলব্ধির জন্য পরিবারের সদস্যরা বাস্তবতা অনুসারে করেন বিভিন্ন কিছু। যেমন পরিবারে ও দলে গির্জা ও গোশালা সাজানো-শিশুযিশু চুম্বন, বিভিন্ন ধরণের প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ, জীবন পরিবর্তন ও আধ্যাত্মিক নবায়ন, দান-ধ্যান, দয়ার কাজ, অভাবী-অসুস্থ্য-দরিদ্রদের সাথে ভোজন ইত্যাদি। তবে প্রতিদিনের জীবনের সাধারণ বাস্তবতায় সেসবের ব্যাপক প্রসার ও কার্যকরী হলে আরো বেশী সুফল আসতো।

ঠিক তাই, অনেক কয়েক জন রয়েছেন যারা অন্তরের সরলতায় এসময় অনেকবার ধর্ম-কর্ম করা, গির্জায় যাওয়া আসা প্রভৃতিতে সময় অতিবাহিত করতে পছন্দ করেন। তারা গির্জাঘর ঘিরে উদারভাবে অনেক কিছু করেন আর সেভাবে বড়দিনে তাদের অনেক সময় চলে যায়। তবে এরূপ মানুষের সংখ্যা অনেক কম এবং দিনে দিনে তা কমতে শুরু করেছে। তবে অনেক জোর দিয়ে বলছি এরূপ ভক্তবিশ্বাসীর সংখ্যা সর্বত্র অনেক বাড়াতে হবে। তাহলে সুখ, শান্তি বাড়বে। সে ধরনের উদ্‌যাপনের সঠিক প্রচার ও প্রকাশ হতে হবে সর্বত্র। তখন আশেপাশের অন্য সকলে বড়দিনের উৎসবের সঠিক ধারণা পেতে পারবে।

বড়দিনকে ঘিরে ভিতরের কিছু মন্তব্য

অনেক সময় মনে হয়, বলা হয়, পরিবারে বড়দিন উদ্‌যাপন যেন আমাদের অন্তরের আশা পূরণ করতে পারেনা- বেশী আবেদন রাখতে পারেনা। সেভাবে সুখশান্তিও আসে না। সময় গতিতে এসেছে আবার সময় গতিতেই চলে যায়। তার পর সব কিছু আবার আগের মত। তাই ডিসেম্বরের ২৫ তারিখ বিকালেই আমাদের দেশে অনেককে বলতে শুনি এবারে বড়দিন শেষ হয়ে গেছে আবার আগামী বছরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

২৫ ডিসেম্বর হল সবার প্রতি শুভেচ্ছার বড়দিন, পরস্পরের সাথে খোলাখুলি, অকপট হবার বড়দিন, ঈশ্বর উপলব্ধিতে পূর্ণ হবার বড়দিন। পরিবারে খাঁটি, আধ্যাত্মিক বড়দিন পালন করতে গেলে সাথে আরো অনেক কিছু আসে। সেখানে আসে নৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সম্পর্ক, আনন্দ কোলাহল, কিছু কিছু মূল্যবান কথা, উপহার দান ও প্রাপ্তি ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে সেসবের অনেক কিছুর প্রতিফলন আসা প্রয়োজন। সমস্ত কিছু করার ক্ষেত্রে সঠিক মাত্রা রাখাও প্রয়োজন। সেখানে সাথে তাই আসা উচিৎ আধ্যাত্মিক উন্নতিও।

-বিদেশে দেখেছি বাবা-মায়েরা পরিবারে সন্তানদের অপেক্ষা করেন বছরে অন্তত বড়দিনে একত্র হতে, সময় অতিবাহিত করতে, একসঙ্গে আন্দপূর্ণভাবে ভোজন করতে, নিজেদের মধ্যে সহভাগিতা করতে। সেভাবে বড়দিন তাদের জন্য হল পারিবারিক মিলনোৎসব, আনন্দ আসর।

-আজকের যুগে স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা অনেক বাড়ছে, এমতাবস্থায় সকলে যেন অন্যের প্রতি বিশেষভাবে পরিবারের সদস্যদের প্রতি মনোযোগী হতে পারে সেজন্য পরিবারের সকলে এ বিষয়ে আরো বেশী গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। যেন মানুষ নিজেকে নয় অন্যকে মর্যাদা ও মূল্য দিয়ে সত্যিকার পরিবার ও মানব সমাজ গড়ে তুলতে পারে।

-মানুষের আজ ব্যক্তিপ্রীতি, ব্যক্তিনীতি বাড়ছে- নিজেকে নিয়ে সবাই মহা ব্যস্ত অন্যের দিকে তাকাতে অন্যের জন্য কিছু করতে বেশী সুযোগ, সময়, ইচ্ছা মনোযোগ, পরিবেশ, আবেগ থাকে না। এভাবে সবাই যেন অচেনা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। সবাই চাই, চাই, খাই-খাই করে, নাই দাও, আমার প্রথম, আগে দরকার। আমি সুখ চাই, আরাম চাই, সহজে চাই, ভাল চাই। এরূপ মনোভাব, বাস্তবতা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অনেক কাজ করছে। মানুষ আজ কাছে থেকেও দূরে, বহুদূরে, মোবাইলে বা অন্য জগতে অনেকবার ব্যস্ত, মহাব্যস্ত।

-মানুষ পরিবারে অন্যের কষ্ট আজ আর অনেকবার বুঝে না- বুঝলেও ভিতরে বা সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করে না। ফলে অন্যের জন্য কিছু করতে এগিয়ে আসে না বা কোন পদক্ষেপ বা উদ্যোগ নেয় না।

-অনেক বাবা-মা সন্তান সাবালক হয়ে গেলে যেন আগেই আলাদা ক'রে দিতে চায়। সেখানেই সন্তানদের দায়িত্ব থাকে তাদের পিতা-মাতাদের প্রতি। সে বিষয়টি আজ অনেক অবহেলিত।

শেষের দিকে কিছু কথা:

যাহোক, আমাদের পরিবারে বড়দিন উদ্‌যাপনের ভিতর বাহিরে সমন্বয় খুঁজে বের করতে হবে। বড়দিনে বিভিন্ন জিনিস উপহার হিসেবে আদান-প্রদানের মাধ্যমে ও নানা সহভাগিতায় পারিবারিক আনন্দ ও বন্ধন গভীরতর করা সম্ভব হতে পারে।

অন্যদিকে সবাই মিলে তৎপর, সচেতন, যত্নশীল ও উদার হলে বড়দিন পালন সত্যিই উপকারী উৎসব হবে। সকলে কাছাকাছি থেকে যেন এদিন পালন করা হয়। এভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক ও আদান প্রদান গভীর হয়, নিজেদের আন্তরিকতা বাড়ে।

কে কত কিছু করে-এখানে সেখানে সময় কাটায়। বর্তমানে মানুষের কত ব্যস্ততা। পরিবারে দিতে সময় কৈ? সেদিক থেকে চিন্তা করলে বড়দিন এমন একটি দিন যে দিন পরিবারের সদস্যরা একত্রে বসতে, খেতে, একত্রে আনন্দ করতে অবশ্যই সুযোগ ব্যবহার করা উচিৎ। ২৫ ডিসেম্বর তো আর বার বার বা প্রতিদিন আসে না? এদিনকে সর্বাঙ্গে সুন্দর, আনন্দপূর্ণ, স্মরণীয় করতে সবার অনেক তৎপরতা প্রয়োজন।

তারপরেও বড় দিন হল যিশুর জন্মের উৎসব সেটা যেন মূল গুরুত্ব পায়। তবে সবার মনে রাখতে হবে যাকে ঘিরে আনন্দ তাঁকে বাদ দিয়ে কি প্রকৃত আনন্দ করা যায়? আমাদের তো অনেকবার সে প্রবণতা আসতে পারে। আর তাই আমাদের সে আনন্দ স্থায়ী হয় না, সহজে ম্লান হয়ে যায়। এজন্য আমাদের মুক্তিদাতা যিশুর জন্মদিন কেন্দ্রে রেখে তারই নিরিখে আনন্দ, সাজগোজ, উৎসব, খাওয়াদাওয়া সব করা প্রয়োজন, উল্টাভাবে নয়। তবেই বড়দিন পালন অর্থবহ, আনন্দপূর্ণ ও স্বার্থক হবে। বড়দিন সত্যিকার বড় হবে।

বড়দিন পরিবারে মিলিত হলে একত্রিত হলে এদিন সত্যিই ভাল লাগে পরিবারের সদস্যরা আকুলভাবে তাই এদিনের অপেক্ষায় থাকেন। সত্যিই এদিন হল সামাজিকভাবে, পারিবারিকভাবে একত্রে পালন করার দিন। এভাবে এদিন যদি বার বার ফিরে ফিরে আসে তাহলে কত ভাল হত! পরিবারে পরিবারে ভালভাবে বড়দিন পালিত হলে কত সমস্যা, জটিলতা, ভুল বুঝাবুঝি কমে যেত, মানুষে মানুষে সত্যিকারের মিলন আসতো। পরিবারে মানুষ আরো বেশী সুখে থাকতো। পরিবারে বড়দিন পালন সবার জন্য সত্যিই মহোৎসব হোক- এ প্রার্থনা করি॥

পরিবারে বড়দিন ও বাস্তবতা

শ্যামল হিলারিউস কস্তা

"খোকা, তুমি এবার বড়দিনে দেশে আসো, তোমায় বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। কতদিন হয় তোমায় দেখি না। আসছে বড়দিনে তোমার বোন শিউলীর বিয়ে হবে, বড় বোনটির বিয়েতেও তুমি থাকতে পারো নি। কিন্তু ছোট বোনটির বিয়েতে থাকবে। বড়দিনের পর পরই বিয়ের দিন-ক্ষণ পড়বে।" ফ্রান্সে থাকা একমাত্র ছেলের প্রতি মমতাময়ী মায়ের আকুতি। অনেক কষ্টে ফ্রান্সে যাওয়া ছেলের এখনও বৈধ কাগজ হয় নি। এই মুহূর্তে দেশে এলে সে আর যেতে পারবে না। মায়ের চিঠি পড়ে কষ্টে ছেলের বুক ফেঁটে কান্না আসে। গত কয়েকটি বছর বাবা মা ও বোনদের ছাড়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শহর প্যারিসে বড়দিন পালন যেন ধূ-ধূ মরুভূমির মতো মনে হয় ছেলে পলাশের।

বড়দিন এলে আমাদের মানব জাতির জন্য তথা খ্রিস্টান পরিবারের জন্য কি অর্থ ও তাৎপর্য বয়ে নিয়ে আসে? শিশুদের মতো করে যদি বুঝতে চাই, তবে বুঝবো- বড়দিন হলো যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসব। আমরা যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন পালন করি। সারা পৃথিবীতে বড়দিনকে ঘিরে সবচাইতে বেশি কেনাকাটার ধুম পড়ে। মহা বাণিজ্যিক কর্মযজ্ঞ ঘটতে থাকে এই বড়দিনকে কেন্দ্র করে। ঘর-বাড়ি সাজানো-গোছানো, হরেক রকম খাবার আয়োজন, পার্টি আর পার্টি। আনন্দ আর হৈ-হুল্লুর ডিসেম্বরের ২০ তারিখ হতে জানুয়ারি মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত চলতেই থাকে। এই সবের মধ্যে আসলে আমরা যিশুখ্রিস্টের জীবনের কথা, তার শিক্ষার কথা, তার জীবনাচরণের কথা অনেকটাই ভুলে থাকি।

বড়দিন কি আসলে বড়দিন আদৌ হতো? যদি যিশুখ্রিস্ট মানব জাতিকে ভালোবেসে নিজের জীবন উৎসর্গ না করতেন? বড়দিন কি বড়দিন হতো যদি যিশুখ্রিস্ট মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থান না করতেন? বড়দিনের গভীর অর্থ হল আপনার আশেপাশের মানুষকে ভালোবাসা, নিরাশায় মানুষের পাশে থেকে আশা জোগানো, তার সুখে দুঃখে অংশীদারী হওয়া। তাইতো বড়দিন হলো আশা ও আনন্দের উৎসব। যা শুধু খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে গেছে অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসীদের মাঝেও।

এখন উৎসব হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যিশুখ্রিস্টের শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন হচ্ছে কতটুকু? মানুষ শুধু টাকার পিছনে ছুটছে। মাথায় তেল আছে এমন তেলওয়ালা মাথায় শুধু তেল দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হচ্ছে। যিশুখ্রিস্ট গো-শালায় জন্ম নিয়েছেন এর থেকে হত-দরিদ্র রূপ আর কি হতে পারে? কিন্তু বাস্তবতায় আমরা হত-দরিদ্রতা দূরের কথা আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে কেউ অস্বচ্ছল থাকলে তার বা তাদের কতটুকু খোঁজ-খবর রাখি? পারলে তাদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলি। মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কগুলি আজ টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত ও বস্তুবাদী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আজকের নিবন্ধের বিষয় হল পরিবারে বড়দিন ও বাস্তবতা। তাই পরিবার পর্যায়ে বড়দিনের ভূমিকা নিয়ে কথা বলব কিছুটা কঠিন বাস্তবতার আলোকে।

লেখার শুরুতে ছেলে পলাশকে বেশ কয়েকটি বছর বড়দিনে না পেয়ে মায়ের যে আকুতি সেই একই আকুতি বেদনার আনাচে-কানাচে বিরজমান। বছরের পর বছর কত কত বাবা-মা তাদের ছেলে-মেয়েদের ছাড়া বড় দিন উদ্‌যাপন করছে। আবার আদর-যত্ন ও ভালোবাসায় গড়ে তোলা ছেলে-মেয়েরা বিয়ের পর বাবা-মায়ের দেখভাল করছে না। বছরের পর বছর বিদেশে চাকুরি করে দেশে এসে অনেক বাবা স্ত্রী-সন্তানকে বড়দিনে সময় না দিয়ে পানাহারে ডুবে থাকছে। বড়দিন এমন স্বামী ও বাবার জন্য কি বার্তা বয়ে নিয়ে আসে? বড়দিন হল ভালোবাসা, আশা ও আনন্দ। কিন্তু বড় দিন বাস্তবতায় যেন হয়ে উঠে পানাহারের এক মহা উপলক্ষ। আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাস, আদর্শ ও অভ্যাসের মধ্যে বড় রকমের ফাঁক রয়ে গেছে। একই সাথে রয়ে গেছে মানবিক মূল্যবোধ ও নীতির চরম অবক্ষয়। বলতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের গোটা সমাজ নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রশ্নে 'ডেঞ্জার জোনে' অবস্থান করছে অনেক বছর আগে হতেই। বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে বিষয়গুলো আনার আগে আমাদের ঘরে ঘরে সচেতনতা ক্যাম্পেইন শুরু করতে হবে, বিশেষতঃ পরিবারের ছেলে-মেয়ের সাথে পিতা-মাতার বড়দিন পালন করার কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ বলতে চাই।

প্রথমতঃ বড়দিনে আমরা ছেলে-মেয়েদের উপহার দেই কিন্তু ছেলে-মেয়েদের আমরা কি কখনও বলেছি, উৎসাহিত করেছি পাড়ার অবস্থাহীন পরিবারের ওদের সমবয়সী ছেলে-মেয়েদেরকে হাতে তৈরি কিছু বানিয়ে উপহার সামগ্রী দিতে? এতে করে যাদের যথেষ্ট নেই তাদের প্রতি সহমর্মিতার অনুভূতি তৈরি হবে। অন্যকে দেবার যে আনন্দ, সেই আনন্দ প্রাপ্তি ঘটবে। অন্যকেও আনন্দিত করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ বড়দিনে আনন্দ ও ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় হয়। ছেলে-মেয়েদের সাথে কোয়ালিটি টাইম কাটানোর ফলে পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের জমানো মানসিক চাপ আনন্দ-উৎসবে রূপান্তরিত হয়ে মানসিক শক্তির নতুন মাত্রা অর্জন করে।

তৃতীয়তঃ বড়দিনে আমাদের ধর্ম বিশ্বাস নবায়ন করাতে যেমন সাহায্য করে তেমনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও শ্রদ্ধা, সম্মান ও সহ-অবস্থানকে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ করতে সহায়তা করে। যিশুখ্রিস্ট সকল মানব জাতির জন্য ভালোবাসার বাণী নিয়ে এসেছেন, সেই ভালোবাসা ভেদাভেদ নয়, সাম্যবাদকে উচ্চে তুলে ধরে।

চতুর্থতঃ বড়দিনে পরিবারের সবার একত্রে ডিনার করা যেন স্বর্গীয় আনন্দকে এ-ধরায় নিয়ে আসে। সারা বছর একে অপরের সাথে দেখা না হলেও বড়দিনে পরিবারের সবার পারস্পরিক বন্ধন ও ভালোবাসা যেন নতুন প্রাণ ফিরে পায়।

পঞ্চমতঃ বড়দিন শুধু কোন উৎসব নয়। এটি একটি আবেগ, একটি স্পিরিট। এই জাগতিক দুনিয়ায় বাড়ি-গাড়ি, টাকা-পয়সা, পদ-পদবি ও ক্ষমতা মুখ্য কোন বিষয় নয়। বরং ভালোবাসা, দয়া, সম্প্রীতি ও সহযোগিতা তার চাইতে হাজারগুণ বেশি মূল্যবান। এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে মানুষের প্রতি দরদ ও ভালোবাসার বিকল্প কিছু নেই। আর এর প্রাথমিক শুরু ও অনুশীলনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো পরিবার। আপনার সন্তান কতটুকু মানবিক মানুষ হবে তার প্রায় পুরোটাই নির্ভর করছে আপনি পরিবারের ভিতরে সুখ-দুঃখ কতটুকু সহভাগিতা করছেন, বড়দিন তো সেই সহভাগিতারই সবচাইতে বড় সুযোগ। সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা॥

মারীয়ার কোলে যিশু ও আমি

সিস্টার মমতা ভূঁইয়া এসসি

মানব জীবনে বড়দিনের গুরুত্ব অনেক। যিশুর আগমনে রচিত হয় স্বর্গ-মর্তের মিলন-সেতু। ঈশ্বর-মানুষে ও মানুষে-মানুষের মিলনের দিন। এর পূর্ণতা প্রকাশ পায় শুধু বাহ্যিক প্রস্তুতির মধ্যে নয় কেবলমাত্র শুদ্ধ-পবিত্র অন্তরে, হৃদয় গোশালায় তাঁর নব জন্মের মাধ্যমে। পারস্পরিক ক্ষমা ও মিলনের মধ্যেই বড়দিন উৎসবে মনে আনে শান্তি, বৃদ্ধি পায় সম্প্রতির বন্ধন। মানব মুক্তির ইতিহাসে কুমারী মারীয়ার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মণ্ডলীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন আমাদের মঙ্গলার্থে। যিশু ঈশ্বর হয়েও মানববেশে এ পৃথিবীতে এলেন। কুমারী মারীয়াকে বাদ দিয়ে আমরা "বড়দিন" কথা ভাবতে পারি না। কুমারী মারীয়ার গর্ভে যিশুর জন্মের মধ্যদিয়ে প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতার আগমন ঘটে। মারীয়া স্বর্গদূতের কথায় "হ্যাঁ" বলে ঈশ্বরের বাক্য নিজের অন্তরে ও দেহ ধারণ করলেন। আর সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি ঈশ্বর পুত্রের জননী হয়ে উঠলেন। তাঁর এই সম্মতি দানের মধ্যদিয়েই জগতের জন্য নব-জীবনের সূচনা হয়েছে। এমনকি ইস্রায়েল জাতির আশাও পূরণ করেছেন।

মানুষ হিসাবে জন্ম নিলেই কেউ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে না। মানব জীবনের গঠন ও বিকাশ শুরু হয় শিশুর জন্মের পর থেকেই, এমনকি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায়। মানবজীবনে পিতা-মাতা, পরিবার, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আত্মীয়-স্বজন বিভিন্নভাবে কমবেশী ভূমিকা রাখে। অন্ধকার রাত্রিতে আলো যেমন আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে সাহায্য করে তেমনি কুমারী মারীয়া উজ্জ্বল আলোর ন্যায় ঈশ্বরের প্রতি তার বাধ্যতা দ্বারা মানব জাতিকে মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। আমরা যিশুকে পেয়েছি মুক্তিদাতা হিসাবে। মারীয়া যিশুকে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন মুক্তিদাতা হিসেবে। যাতে করে আমরা অন্ধকার থেকে আলোতে ও আলোর মানুষ হতে পারি এবং যিশুর আশ্রয়ে বাস করতে পারি। পৃথিবীতে আমাদের খ্রিস্ট বিশ্বাসের যাত্রা শুরু হয় যিশুর আগমনের মধ্যদিয়ে। স্বয়ং ঈশ্বর নিঃস্ব হয়ে মানবরূপে এই পৃথিবীতে জন্ম নিলেন। তাই বড়দিনে আমরা যিশুর জন্মের রহস্যের কথা ধ্যান করি।

মুক্তির ইতিহাসে যিশুর পরেই মা মরীয়ার স্থান। মা-মারীয়ার "হ্যাঁ" সম্মতির মধ্যদিয়েই বহু যুগের প্রত্যাশার আবসান ঘটেছে। ঈশ্বরের বাণীকে নিজের জীবনে ধারণ করে মুক্তির কাজে সহায়তা করেছেন। অতি সাধারণ ঘরের

ছবি: পল ডি'কস্তা

মেয়ে মারীয়ার গর্ভে, বেথলেহেম নগরীতে সম্রাট সিজার আগস্টাসের শাসনকালে যিশু জন্মগ্রহণ করেন। যিশুর জন্ম নিয়ে পুরাতন ও নুতন নিয়মে উল্লেখ রয়েছে, *"বাণী হলেন রক্ত মাংসের মানুষ, বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে (যোহন, ১:১৪)।"* যিশুর জন্মের মধ্যদিয়ে ঐশ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয়েছে। পণ্ডিতগণ আকাশের তারা দেখে যিশুর সন্ধানে বেথলেম এলেন এবং দেখতে পেলেন, একটি যাবপাত্রে শোয়ানো যিশু, আর মারীয়া পাশে তাঁর পরিচর্যায়। মারীয়া একজন আদর্শ মা ছিলেন। যিশুর জন্ম তার কাছে রহস্যজনক। তবুও তিনি যিশুকে মাতৃস্নেহে ও ভালবাসা, যত্ন দিয়ে মানব যিশুর মতই বড় করে তুলেছেন। তাঁর সেবা-যত্ন করেছেন, কোলে তুলে তাকে রক্ষা করেছেন, যে কোল একজন শিশুর একান্ত নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তেমনি কুমারী মারীয়াও যিশুকে তাঁর মাতৃ কোলে সর্বদা আশ্রয়ে রেখেছেন। আমরা দেখি পরবর্তীতে তিনি ছোট শিশু-যিশুকে রাজা হেরোদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কোলে নিয়ে অন্ধকার রাত্রিতে মিশর দেশে পলায়ন করেন। হেরোদ রাজা মৃত্যুর পর আবার নাজারেথে ফিরে আসেন এবং যিশুর প্রকাশ্য জীবন শুরু করেন। এভাবে দিনের পর দিন শিশুযিশুকে মাতৃস্নেহে, ভালবাসা ও সুশিক্ষায় বড় করে তোলেন। যিশুর জন্ম থেকে শুরু করে ক্রুশের উপর মৃত্যু পর্যন্ত মারীয়া যিশুকে সঙ্গ দিয়েছেন। ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে নিজ দেহধারী পুত্রের মৃত্যু যন্ত্রণার সহভাগী হয়েছেন। মারীয়া ঈশ্বরের উপর অগাধ বিশ্বাসের কারণে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে আত্ম-সমর্পণ করতে পেরেছেন। তাই মা-মারীয়ার সন্তানের প্রতি তার খাঁটি ভালবাসা প্রকাশ পায়। যিশুর প্রতি যে ভালবাসা ছিল একই ভালবাসা দেখিছেন মানুষের প্রতি। তাই মারীয়া হলেন সকল মানুষের ভালবাসার আদর্শ। যিশু যখন মন্দিরে হারিয়ে যান তখন একজন প্রকৃত মায়ের মত তিনি বিচলিত হয়ে যিশুর খোঁজ করেন *(লুক, ২:৪৮)*। এখানে সন্তানের প্রতি তার গভীর চিন্তা ও দায়িত্ব প্রকাশ পায়। এখানে মারীয়ার মাতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায় যে, তিনি একজন মা। তিনি একজন সাধারণ মায়ের মত যিশুর জন্য সবকিছু করেছেন, নিজ আদর্শে বড় করেছেন। তার মাতৃত্ব ভালবাসার সাথে সংযুক্ত।

ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে পেরেছিলেন *(যোহন ২:৩৬; লুক ১:১৩)* তার পুত্রের প্রতি ভালবাসার কারণে। যিশুকে সঠিক পথের পথ দেখাতে, সুন্দর ভাবে গড়ে ওঠার মধ্যদিয়ে সুখী জীবন-যাপন করতে

এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে সবর্দা চেষ্টা করেছেন। সুতরাং মারীয়া হলেন মণ্ডলীর প্রতিও ভালবাসার আদর্শ। এ জগতের মায়েরা মারীয়ার আদর্শকে তাদের জীবনে অনুকরণ করে তাদের সন্তানদেরকে ভালবাসেন, আদর করেন, কোলে তুলে নেন। চেষ্টা করেন খ্রিস্টীয় শিক্ষায় বড় করে তুলতে। মা মারীয়া হলেন জগতের সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের দান সরূপ এবং ঈশ্বরের জন্য উপহার। মারীয়া হলেন ভালবাসার প্রতিফলন, তাই তিনি স্বর্গীয় ভালবাসার সন্তানকে আঁকড়ে রাখতে চান। তিনি কখনও চান না, আমরা মায়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হই। তাই তিনি প্রতিনিয়ত আমাদের তার কোলে শক্ত করে ধরে রাখেন, মাতৃস্নেহে পরিচালনা ও রক্ষা করেন। অপর দিকে কুমারী মারীয়ার কুমারীত্ব, যিশুর জন্ম ও মৃত্যু এই তিনটি ঘটনা মণ্ডলীতে খুবই রহস্যময় ঘটনা। তিনি যিশুকে মানব স্বভাবের জন্য মা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মারীয়ার মাতৃত্ব মুক্তি পরিকল্পনায় এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। মা হিসেবে তিনি যিশুর সুখ-দুঃখের শেষ পর্যন্ত পাশে থেকেছেন। তিনি যিশুকে বড় হতে, কষ্টভোগ ও মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত করেছিলেন। ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে নিজ দেহধারী পুত্রের মৃত্যু যন্ত্রণার সহভাগী হয়েছেন। মারীয়ার ভালবাসা আমাদের সকলকেই আর্কষণ করে। মায়ের প্রতি সন্তানের আর্কষণ হলো তার ভালবাসা। মাতৃছায়া থেকে তার ভালবাসা আস্বাদন করা ও মায়ের কোলে থাকা। মায়ের কোল হলো সন্তানের একমাত্র নিরাপদ স্থান। একজন মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক নাড়ীর সম্পর্ক। তাইতো একজন সন্তান বিপদে পড়লে মা প্রচন্ড ব্যাথা পান। সন্তান যতই খারাপ হোক না কেন মায়ের হৃদয় গভীরে সন্তানের প্রতি তার স্নেহ-ভালবাসা থেকে যায়। আমরা বলতে পারি মারীয়া হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসার মা। একজন মা তার সন্তানকে কি পরিমান ভালবাসতে পারেন তা মা-মারীয়ারকে না দেখলে বোঝা যায় না। মা আমাদের দুর্দিনে তার কোলে আগলে রাখেন। মা তার মাতৃ-ছায়ায় সকল বিপদ থেকো রক্ষা করেন। আমরা জাগতিক মায়ের ভালবাসা থেকে অভিজ্ঞতা করছি। একটি শিশু যখন কান্না-কাটি করে মা কোলে নিলেই তার পরম শান্তি। আমরা যখন হতাশায় ভুগি, কষ্ট পাই রোগে-শোকে ভুগি তখন আমরা স্বর্গীয় মায়ের আশ্রয় খুঁজি। আমারা মারীয়ার মধ্যদিয়ে প্রার্থনা করেই যিশুর কাছে যাই ও তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস দিন দিন বৃদ্ধি করি। মায়ের ভালবাসা আমরা ব্যাক্তি জীবনে উপলব্ধি করি। মা-মারীয়া প্রতিনিয়ত আমাদের তার স্নেহ-ভালবাসা ও দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। কোন বিপদে বা অসুস্থতায় পড়লে আমরা মায়ের আশ্রয় নেই, বিশ্বাস নিয়ে তার শরণাপন্ন হই। তিনি আমাদের সকল প্রকার অনিষ্ট এবং বিপদ থেকে রক্ষা করেন। মা-মারীয়া আমাদের কখনও হতাশ করেন না, দূরে সরিয়ে রাখেন না। তিনি আমাদের সকল চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজনের কথা হৃদয়ে গেঁথে রাখেন এবং তার পুত্রের নিকট অনুনয় করেন।

আসলে বড়দিন হলো ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পূনর্মিলনের সেতুর মতো। এই বড়দিনকে ঘিরে কত চিন্তা, কত বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি! বড়দিনের প্রতিবেশিতে কত গুণী জনের কত তাৎপর্যপূর্ণ লেখা, মা-মারীয়াকে নিয়ে, শিশু যিশু ও সাধু যোসেফকে নিয়ে অনুপ্রেরণামূলক লেখা যা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। তবে আমরা কতজন মনোযোগ দিয়ে পড়ি ও ধ্যান করি। আমাদের বড়দিন তখনই স্বার্থক হবে যখন আমরা আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রভুর নব-জন্ম ঘটাতে পারব। বড়দিন তখনই স্বার্থকতা লাভ করবে যখন পারিবারিক দ্বন্দ্ব মিটাতে পারব, ছেলে-মেয়েরা খ্রিস্টীয় মূল্যবোধে জীবন-যাপন করবে, যারা নেশাগ্রস্ত তারা যিশুর চরণে ফিরবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যুদ্ধ, হিংসা মারা-মারি বন্ধ হবে। আমরা যখন পরস্পরকে সম্মান ও মযার্দা দিতে সক্ষম হবো। সবকিছু ভুলে গিয়ে সহযাত্রী মণ্ডলীর মনোভাব নিয়ে এক সাথে বড়দিন উৎসব করব। মানুষে-মানুষে মিলনের মধ্যদিয়ে বড়দিন উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হবে।

পরিশেষে, আমরা সন্তান হিসেবে মা-মারীয়ার আদর্শ অনুকরণ করে ও স্নেহের আঁচলতলে থেকে প্রতিষ্ঠিত করি ভালবাসার এক নতুন নিবাস। যিশুর জন্ম সবার মধ্যে প্রকৃত মনুষত্বের জন্ম নিক। সবার অন্তরে যেন খ্রিস্টরাজা যিশুর রাজত্ব ঘটে। তাঁর জন্ম হউক আমাদের চেতনায় এবং তাঁর জন্মের রূপান্তর ঘটুক প্রত্যেকের হৃদয়-গোশালায়। কুমারী-মারীয়া একজন আদর্শ মা, যাকে আমরা অনুকরণ করতে পারি। মারীয়া একজন মা যার সেবাযত্ন, সহায়তা, ভালবাসা ও মাতৃ-কোলের আশ্রয় আমাদের সকলের প্রয়োজন॥

নববার্তা

সংগ্রামী মানব

আজ এ মহা আনন্দ লগনে
এসেছ তুমি নব রূপে
এ পাপসিক্ত ধরণীতে।
খ্রিস্ট নামে সামদৃত
চারপাশ মুখরিত।
দীনবেশে থেকেছ
মায়াবতীর মাতৃস্নেহে।
ওগো পুণ্যশীল সাধক
জ্ঞানী, গুণী প্রকৃতজন
সদা রয়েছি তাঁকিয়ে
পেতে নব দিশা
চোখাশ্রু ম্লান হয়ে
ভালবাসায় ভাসবে
সুখ-দুঃখ সাথে নিয়ে
মোর মাঝে থাকবে।
প্রিয়তম মার্জনা কর
পাপ-কালিমা জরা-জীর্ণতা
রোধে একত্রে পথচল।

শুভাগমন

রিপন লিংকন সাহা

রাত পোহালেই বড়দিন
যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন
সজ্জিত গির্জা, সজ্জিত শহর
কাটবে কেক হরেক রকম।
সান্টা দাদু ঝোলা কাঁধে
আসবে অনেক উপহার নিয়ে
মাথার কাছে রুমাল রেখে
ঘুমায় শিশুরা সেই আশাতে।
আরেক শিশু থাকে আশায়
অনেক কষ্টে রাত সে কাটায়
গরম পোশাক নেই যে তেমন
শীতের জোরে হয় সে কাতর।
শুকনো রুটি অল্প খেয়ে
কোনো মতে আধ-পেট ভরে
সান্টা দাদু জাদু করবে
দুঃখ কষ্ট সকল পালিয়ে যাবে।

ক্ষুদ্র গোশালায় জন্মদিনের আনন্দ

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

গোশালা ও জন্মদিন মানেই যিশুর জন্মদিন, বড়দিন উৎসব। যিশুর জন্মদিনে ক্ষুদ্র গোশালায় যাওয়া ও জন্মদিনের আনন্দ সহভাগিতা করাই যিশুর জন্মদিন বড়দিনের সার্থকতা। গোশালা মানেই মিলনের আনন্দোৎসব। বড়দিন মানেই গোশালা তৈরি, সেখানে যাওয়া ও ঈশ্বর পুত্র যিশুকে ভক্তি প্রণাম জানান ও সম্মিলিত মিলনোৎসব অংশগ্রহণ করা। আমরাও স্মরণ করি আমাদের মানব জীবনের অবস্থা। যিনি বাণী, তিঁনিই ঈশ্বর, তাঁর জন্ম মানববেশে মানুষের মাঝে (*যোহন ১:১;১৪*) ক্ষুদ্র গোশালায়। এ যেন জগতের মাঝে সত্যের ও অনুগ্রহের পূর্ণতা (*যোহন ১:১৪খ*) যার ফলে আমরা পেয়েছি অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ (*যোহন ১:১৬*)। জগতে এই অনুগ্রহ পূর্ণতা পায় যিশুর জন্মে ও তিঁনি (যিশু) দেহধারী বাণী আশ্রয় নিয়েছেন ক্ষুদ্র গোশালায়। তাই আমাদের এত আয়োজন, ক্ষুদ্র গোশালায় জন্মদিনে মহামিলনের আনন্দ আয়োজন।

আমাদের আনন্দ আয়োজনের পূর্ণতা পায় ক্ষুদ্র গোশালায়। ক্ষুদ্র গোশালায় জন্মদিনের আনন্দ হল;

ক) ক্ষুদ্র গোশালা প্রতীক্ষার অবসান

ঈশ্বরের জগতে জন্মগ্রহণ ও দীনতাকে গ্রহণ করে গোশালায় অবস্থানের মধ্যদিয়ে প্রবক্তাদের ভবিষ্যৎবাণীর পূর্ণতা পেয়েছে। *'প্রাচীনকালে ঈশ্বর কথা বলেছেন প্রবক্তাদের মধ্যদিয়ে, আর এখন তিঁনি কথা বলেন আপন পূত্রেরই মূখ দিয়ে (হিব্রু ১:১)।'* "দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে, তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল (*ইসাইয়া ৭:১৪খ*)।" এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবতায় ধরা দেয় কুমারী মারীয়ার কাছে দাঁতের যিশুর জন্ম সংবাদ প্রদানের মধ্যদিয়ে। প্রভুর দূত কুমারীকে বলেন তুমি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিবে ও তাঁর নাম রাখবে যিশু (*লুক ১:২৮-৩২*)। তিনি অনন্য মন্ত্রণাদাতা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, শান্তির রাজপুত্র (*ইসাইয়া ৯:৬*)। খ্রিস্ট যিশুর মানব দেহধারণ শাশ্বত ঐশবাণীর মাধ্যমে প্রত্যাশার অবসান ও ঈশ্বরের চিরন্তন ভালোবাসার প্রকাশ। ইম্মানুয়েল (আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর), যিশু (প্রভুই ত্রাণকর্তা/পরিত্রাণ/মুক্তি/the Lord is Salvation) ও খ্রিস্ট (অভিষিক্ত)। জগতে মানবের সাথে ঈশ্বর যিনি, তিনি জগতের পরিত্রাণ করতে অভিষিক্ত হয়েছেন। জগতের যিনি ত্রাণকর্তা, তিনি জন্ম নিয়েছেন মানববেশে ও আশ্রয় নিয়েছেন ক্ষুদ্র গোশালায়।

খ) ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ

পিতা ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রমাণ ও পূর্ণতা পায় যিশুর জন্মদিনে। *"পরমেশ্বর জগতকে এতই ভালোবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করে দিয়েছেন (যোহন ৩:১৬ক)।"* জগতে ঈশ্বরের মহান ভালোবাসা ও অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। *"সত্যিই তো আমরা সকলে তাঁর পূর্ণতা থেকে লাভবান হয়েছি: লাভ করেছি অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ (যোহন ১:১৬)।"* ঈশ্বর পুত্র যিশু মানব ইতিহাসে প্রবেশ করলেন, যা ঐতিহাসিক ঘটনায় রূপ নিয়েছে। নাজারেথের কুমারী মারীয়ার গর্ভে, রাজা দাউদের কূলে বেথলেহেম নগরীতে, সম্রাট সিজার অগাস্টাসের শাসনামলে যিশুর জন্ম হয়েছে দীনবেশে ক্ষুদ্র গোশালায় ও কুমারী মারীয়া তাঁকে কাপড়ে জরিয়ে যাবপাত্রে শুইয়ে রাখেন (*লুক ১:২৬-৩৮; ২:১-১৫*)। ঈশ্বরের ভালোবাসার চরম প্রমাণ মেলে ক্ষুদ্র গোশালায়। মানবের পরিত্রাণ দিতে ত্রাণনাথ জন্মিলেন জীর্ণ গোশালায়।

গ) মানবীয় মর্যাদা ও মূল্যবোধ

যিশুর মানব দেহধারণ ও গোশালায় জন্মের মধ্যদিয়ে মানবীয় মর্যাদা পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বরের দীনতা মানুষের পরিত্রাণ। মানব মর্যাদা রক্ষা পায়। তাই অবহেলিত রাখালগণের কাছে আনন্দ সংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে। *"ভয় নেই, দেখ আমি তোমাদের কাছে এক আনন্দের সংবাদ নিয়ে এসেছি। এই সংবাদ সকলের জন্য মহা আনন্দের সংবাদ হবে। কারণ রাজা দাউদের নগরে আজ তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তার জন্ম হয়েছে। তিঁনি খ্রিস্ট প্রভু (লুক ২:১০-১১)।"* আনন্দ সংবাদ কারণ যার (যিশু), তিঁনি সর্বশক্তি ঈশ্বর, দাউদের সিংহাসন তাঁকে দেওয়া হয়েছে ও তাঁর রাজত্ব চিরকালীন *(লুক ১:৩১-৩৩)*। যিশুই খ্রিস্ট প্রভু। অর্থাৎ অভিষিক্ত ত্রাণকর্তা। তিঁনি (যিশু) মানুষ হয়েছেন ও আমাদের সাথে বাস করলেন *(যোহন ১:১৪ক)* ও দীনতাকে বেছে নিয়ে গোশালায় জন্মেছেন ও যাবপাত্রে শুয়েছেন (লুক ২:১২)। এই চিহ্ন হলো ঈশ্বরের মহান উদারতা, দীন দরিদ্র ও অভাবী মানুষের পক্ষ নেওয়া। মানবিক অবস্থার সীমাবদ্ধতাকে যিশু গ্রহণ করলেন। ঈশ্বরও মানুষের কাছে ও মাঝে বাধ্য হয়ে রইলেন। মানুষের সহায়তায় জ্ঞানে ও বয়সে বেড়ে উঠেছেন, ঈশ্বরের ও মানুষের ভালবাসা লাভ করেছেন (*লুক ২:৫১-৫২*)। মানুষ হিসেবে আমাকে অন্তরে দীন হয়ে নিজের মানবীর দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে যিশুকে গ্রহণ করতে হয়। ক্ষুদ্র গোশালা আমাদের এই অনুভূতি ও মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়।

ঘ) মিলন ও আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু

ঈশ্বর পুত্র যিশুর জন্মে স্বর্গের দূত মর্তে ঈশ্বরের প্রশংসাগান করেন; *"জয় পরমেশ্বরের উর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়! ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে (লুক ২:১৪)।"* এই প্রশংসাগান স্বর্গ ও মর্ত্যের, ঈশ্বরের ও মানুষের মিলন। যিশুকে ঘিরে সকলের অংশগ্রহণ। কুমারী মারীয়া ও যোসেফ, ধনী (পণ্ডিতগণ) গরীব (রাখালগণ) সৃষ্টিকূল (উন্মুক্ত প্রকৃতি ও পশু সকল) সবাই যিশুকে দেখতে পেল। স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলন হল (*লুক ২:১-২০; মথি ২:১-১১*)। ঈশ্বর; তিঁনি ইম্মানুয়েল, আমাদের মাঝে ও সঙ্গে বাস করতে এসেছেন। যিশু সবার ও সকল জাতির পরিত্রাণ। তিনি ত্রাণকর্তা! ঈশ্বরের ভালোবাসার মূর্ত প্রকাশ। *"আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসবে, বন্ধুদের জন্যে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা মানুষের আর কিছুই নেই (যোহন ১৫:১২-১৩)।"* ভালোবাসা সবকিছুর উর্ধ্বে। যিশুর জন্মে যেমন বহু মানুষ ও সৃষ্টির অংশগ্রহণ ও মিলন ঘটিয়েছে (*লুক ২:১-২০; মথি ২:১-১১*), তেমনি তাঁর মৃত্যুতেও ক্রুশের তলায় বহু জাতির মানুষের উপস্থিতি ও প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া (*লুক ২৩:২৭-৪৯*) পরিলক্ষিত হয়। আর এতেই প্রমাণিত হয় যিশুর ভবিষ্যৎ বাণী; *"আমি এসেছি যাতে মানুষ জীবন পায়; পুরোপুরি ভাবেই পায় (যোহন ১০:১০খ)।"* যিশু শুধু মানব জন্মই গ্রহণ করেন নি, বরং মানুষের মানবীয় সমস্ত অবস্থার মধ্যদিয়েই গেছেন, আর তা শুরু হয়েছে ক্ষুদ্র গোশালায়।

ঙ) কৃতজ্ঞতায় ফিরে দেখা

স্বর্গদূতদের আনন্দ সংবাদ পেয়ে রাখালেরা বেথলেহেমে গিয়ে যিশুতে দেখতে পায় ও তাদের শ্রদ্ধা প্রনাম নিবেদন করে, আনন্দিত

মনে ফিরে যায় ও শিশু যিশুর কথা প্রচার করে (*লুক ২:১৫-১৮*)। আমরাও গোশালায় যাই। গোশালায় কেন যাই, কি করি ও কেন করি? তা'কি আমরা ভাবি। আমদের গোশালায় গিয়ে ঈশ্বর, পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয়। আমিও ঐ ক্ষুদ্র গোশালার শিশু যিশুর মত ক্ষুদ্র অসহায় ছিলাম। অনেকের (ঈশ্বর, পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও রাষ্ট্র) আশীর্বাদ, ভালোবাসা, যত্ন ও সমর্থনে বেড়ে উঠেছি। গোশালায় শুধু জন্মদিনের আনন্দই নয় বরং নিজের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে হয়। আমার নিজ অবস্থাকে স্বীকার ও গ্রহণ করেই কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্যডালি নিবেদন করে আনন্দিত হওয়া। যিশুর জন্মদিনে গোশালায় নিজেকে খুঁজে পাই। কৃতজ্ঞ হয়ে রাখলদের মত সুসমাচার প্রচার করাই গোশালায় জন্মদিনের পূর্ণ ও পুণ্য আনন্দ।

বর্তমান বাস্তবতায় ক্ষুদ্র গোশালায় জন্মদিনের আনন্দ- যিশুর জন্মদিন (বড়দিন) উৎসব ও গোশালা একটি প্রচলিত প্রথায় রূপ নিয়েছে। গোশালা তৈরি, মহা শোভাযাত্রা করে শিশু যিশুকে গোশালায় উপস্থাপন, মোমবাতি জ্বালিয়ে ধুপারতি করা প্রচলিত রীতি ও উপাসনার অংশ হয়েছে। খ্রিস্ট ভক্তজনগণের গোশালায় যাওয়া ও শিশু যিশুকে ভক্তি প্রণাম ও উপহার প্রদান আমাদের বিশ্বাস প্রকাশের চিহ্ন। যিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে সেদিন তিনটি ঘটনা ঘটেছিল: **১। মিলন (Communion):** ঈশ্বরে মানুষ, মানুষে মানুষে ও সৃষ্টিকুলের মধ্যে (*লুক ২:১০-১৪*), **২। অংশগ্রহণ (Participation):** কুমারী মারীয়া ও যোসেফ, ধনী (পণ্ডিতগণ) গরীব (রাখালগণ) ও সৃষ্টিকূল (উম্মুক্ত প্রকৃতি ও পশু) (*লুক ২:১-২০; মথি ২:১-১১*), **৩। প্রেরণ (Mission):** স্বর্গদূতদের প্রশংসাগান ও রাখলগণ যা দেখতে পেয়েছে তা প্রচার করেছে ও অন্যরা শুনে আশ্চর্য হয়েছে ও মা মারীয়া সমস্ত কিছু অন্তরে গেঁথে রেখেছেন (*লুক ২:১৪-১৮*)।

বর্তমান বিশ্বায়নের অসম প্রতিযোগিতার বিশ্বে মানব কল্যান ও অগ্রগতির সাথে জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারি, যুদ্ধ, ধ্বংস, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পারস্পরিক বিরোধিতায় জগৎ ও জীবন হুমকির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এইসব কারণে মানুষ বাস্তুহারা ও অভিবাসী হচ্ছে। ধনী ও গরীবের ব্যবধান ও ভেদাভেদ বেড়েই চলেছে। প্রতিযোগিতা মানুষকে সফলতা এনে দেয়, কিন্তু মনে রাখাও দরকার অসম প্রতিযোগিতা ও সব সময় সেরাদের সেরা হওয়ার প্রতিযোগিতা আমাকে বড় ও সেরা করে না। ছোট ও ক্ষুদ্রকে গুরুত্ব ও মূল্য দিতে হয়। নিজের মানবীর সীমাবদ্ধতাও স্মরণ করা দরকার। যিশুর জগতে আগমন ও ক্ষুদ্র গোশালায় জন্ম মানব মর্যাদা ও মূল্যবোধ, স্বাধীনতা, অধিকার, মুক্তি (মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক) ভালোবাসা (সত্য, সুন্দর ও ন্যায্যতা) ও মিলন। আজও তো জগতে মানুষ প্রেম সত্য ও মিলনের বাণী শুনেনি। তাই এত অস্থিরতা, ভেদাভেদ ও অসম প্রতিযোগিতা। প্রকৃতিও আজ মানব সভ্যতার অত্যাচারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে বড়দিন জগতের মাঝে মানব জীবন ও সৃষ্টি রক্ষায় নব জাগরণ এবং সম্মিলিত জীবন সাধনা। ক্ষুদ্র গোশালায় যাওয়া ও শিশু যিশুকে দেখা আমাদের নতুন করে শুরু করে বাঁচার প্রেরণা যোগায়। তিঁনি (যিশু), ইম্মানুয়েল ছিলেন, আছেন ও থাকবেন চিরকাল আমাদের মাঝে শান্তি বর পুত্র হয়ে। কেননা, তিঁনি আবারও জন্ম নিতে চান আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগত (সামাজিক) হৃদয় গোশালায়। তাঁর (বাণী/যিশু) দেওয়া শিক্ষানুসারে মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধে জীবন যাপনই আমাদের বড়দিন॥ ৺

যিশুসংঘ (জেজুইট) এর পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

"আহ্বান-ধ্যান ও ইংরেজি শিক্ষা" প্রোগ্রাম-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় কাথলিক ছাত্র-যুবক ভাইয়েরা, তোমাদের যিশুসংঘের ছত্র-ছায়ায় এসে সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধু ইগ্নেসিয়াস লয়োলা, সহ-প্রতিষ্ঠাতা সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ও পোপ ফ্রান্সিস-এর মত ঈশ্বরের নামে মানুষ ও মণ্ডলীর সেবায় আত্মনিয়োগ করার নিবিড় আমন্ত্রণ জানাই! তোমরা যারা ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ HSC পরীক্ষা সম্পন্ন করেছ এবং আহ্বানের জীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য "Come and See" ও "Intensive English Course" এর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

অংশগ্রহণকারী: HSC পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী
আগমন: ৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
রেজিস্ট্রেশন ফি: ১০০০ টাকা
স্থান: নবজ্যোতি নিকেতন, কুচিলাবাড়ি
মঠবাড়ি, গাজীপুর

ফাদার সৃজন এস জে (০১৭৫০১২৯৯২৭)
জেজুইট রেসিডেন্স
১৪২/১এ মনিপুরীপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:
ফাদার এলিয়াস সরকার এস জে (০১৭৭৮২২৫৮২৮)
ফাদার প্রবাস রোজারিও এস জে (০১৭৩২৮৭৫৬৯০)
ব্রাদার নির্মল কিস্কু এস জে (০১৭৪৬৯৯৫৫৬৯)
নবজ্যোতি নিকেতন, কুচিলাবাড়ি
মঠবাড়ি, গাজীপুর

ফা. রোহিত মু, এস জে (০১৭৪৩১৫৫১৪২)
ভবানীপুর ক্যাথলিক চার্চ
বড়াইগ্রাম, নাটোর

ফাদার

উক্ত প্রোগ্রামে যোগদানে ইচ্ছুক ভাইদের ২ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হল।